খুনী চক্রের আস্তানায়

আসাদ বিন হাফিজ

প্রকাশন

ক্রুসেড - ১৯

খুনী চক্রের আস্তানায়

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন

৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮

ক্রুসেড - ১৯

খুনী চক্রের আস্তানায়

[আবদুল ওয়াজেদ সালাফী অনূদিত আলতামাশ-এর 'দাস্তান ঈমান ফারুশোকী'র ছায়া অবলম্বনে রচিত]

প্রকাশক
আসাদ বিন হাফিজ
প্রীতি প্রকাশন, ৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০৫
প্রচ্ছদ : প্রীতি ডিজাইন সেন্টার
মুদ্রণ : প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস
মূল্যঃ [illegible] ৫০.০০

CRUSADE-19
Khuni Chokrer Astanay
[A heroic Adventure of the great Salahuddin]
by : Asad bin Hafiz
Published by : Pritee Prokashon
435 / ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217
Phone : 8321758, Fax: 880-2-8321758
Published on: June 2003
2nd Edition: April 2005

PRICE : [illegible] 50.00

ISBN 984-581-237-6

রহস্য সিরিজ ক্রুসেড

ক্রুসেডের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। হাজার বছর ধরে চলছে এ ক্রুসেড। গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল।
কেবল সশস্ত্র সংঘাত নয়,
কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সে যুদ্ধ ছিল সর্বপ্লাবী।
ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে মেতে উঠেছিল খৃস্টানরা। একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বেছে নিয়েছিল ষড়যন্ত্রের পথ। মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছিল গুপ্তচর বাহিনী। ছড়িয়ে দিয়েছিল মদ ও নেশার দ্রব্য। বেহায়াপনা আর চরিত্র হননের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল মুসলিম দেশগুলোর শহর-গ্রামে।
একদিকে সশস্ত্র লড়াই, অন্যদিকে কুটিল সাংস্কৃতিক হামলা– এ দু'য়ের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়াল মুসলিম বীর শ্রেষ্ঠরা। তারা মোকাবেলা করল এমন সব অবিশ্বাস্য ও শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার, মানুষের কল্পনাকেও যা হার মানায়।

আজ মুসলিম বিশ্বকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আপনাকে জানতে হবে তার স্বরূপ। আর এ স্বরূপ জানতে হলে এ সিরিজের বইগুলো আপনাকে পড়তেই হবে

✖ গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান ✖ সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমাণ্ডো অভিযান ✖ সুবাক দুর্গে আক্রমণ ✖ ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ✖ ভয়াল রজনী ✖ আবারো সংঘাত ✖ দুর্গ পতন ✖ ফেরাউনের গুপ্তধন ✖ উপকূলে সংঘর্ষ ✖ সর্প কেল্লার খুনী ✖ চারদিকে চক্রান্ত ✖ গোপন বিদ্রোহী ✖ পাপের ফল ✖ তুমুল লড়াই ✖ উমরু দরবেশ ✖ টার্গেট ফিলিস্তিন ✖ গাদ্দার ✖ বিষাক্ত ছোবল ✖ খুনী চক্রের আস্তানায়

এ সিরিজের পরবর্তী বই ক্রুসেড-২০

পাল্টা ধাওয়া

অপারেশন সিরিজ

বিশ্বব্যাপী চলছে ইসলামী পূনর্জাগরণ।
চলছে ইসলামবিরোধী শক্তির নির্যাতন
হত্যা-গুম-খুন-ষড়যন্ত্র।
মুক্ত বিশ্বের মানুষ তার অনেক খবরই জানতে পারছে।
কিন্তু চীনের অবস্থা?
ওখানে কি কোন মুক্তি আন্দোলন নেই?
চীনের মুসলমানদের ওপর কি কোন নির্যাতন চলছে না?
চলছে। কিন্তু সে খবর চীনের প্রাচীর ডিঙিয়ে
মুক্ত বিশ্বে আসতে পারছে না।
আর তাই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারছে না
সেখানকার মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী।
তাওহীদুল ইসলাম বাবু
চীনের মুক্তিপাগল মানুষের
মরণপণ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লিখেছেন
এক নতুন রহস্য সিরিজ- **'অপারেশন'**।

বেরিয়েছে অপারেশন সিরিজের পাঁচটি বই

আতংকিত নানকিং ✖ সাংহাই সিটিতে রক্তস্রোত
ব্ল্যাক আর্মির কবলে ✖ হাইনান দ্বীপে অভিযান ✖
অশান্ত চীন সাগর

অচিরেই বেরুচ্ছে অপারেশন সিরিজের পরবর্তী বই

বিধ্বস্ত শহর

খুনীচক্রের আস্তানায়

গুমাস্তগীন তাকে ধোঁকা দিয়ে গেছে, এই রাগে জ্বলছে শেখ মান্নানের সারা শরীর। গুমাস্তগীনের পিছু নেয়ার জন্য সে যে সৈন্য পাঠিয়েছিল, তার মধ্যে মাত্র দু'জন ফিরে আসতে পেরেছে। বাকীরা লিজাকে ছিনিয়ে আনা তো দূরের কথা, নিজেদের জীবনটা পর্যন্ত বাঁচাতে পারেনি। তার সৈন্যরা এমন অথর্ব, ভাবতেই রাগ তার মাথায় উঠে যাচ্ছে। কোথায় গুমাস্তগীন, লিজা ও কারিশমাকে চিলের মত ছো মেরে তুলে নিয়ে আসবে উন্মুক্ত মরুভূমি থেকে, তা নয়, একজন মাথামোটা ভীতুর ডিম, যে তার কাছে এসেছিল যুদ্ধ না করে আইয়ুবীর হাত থেকে বাঁচার জন্য গুপ্তঘাতক ভাড়া করতে, তার হাতে মার খেয়ে মরে গেছে তার সৈন্যরা, এটা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। এ নিশ্চয়ই আইয়ুবীর সেই কমাণ্ডোদের কাজ, কারিশমা ও লিজা যাদেরকে পাকড়াও করে তুলে দিয়েছিল আমার হাতে, ভাবছে শেখ মান্নান। নিজের মনেই সে স্বীকার করল, সময়ের আগে এভাবে ওদের বাইরে বের করা ঠিক হয়নি। সন্ত্রাসী দলের নেতৃত্বে আসার পর এমন ভুল সে আর করেনি। এ ভুলের খেসারত দিতে হলো তাকে একদল জানবাজ অনুচর হারিয়ে।

ফেদাইন সন্ত্রাসীদের একটা খ্যাতি আছে, তারা সাধারণত কোন কাজে হাত দিলে ব্যর্থ হয় না। অপারেশন সফল করার

প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেই তারা কাজে নামে। ফেদাইন খুনীদের এমন পর্যাপ্ত ট্রেনিং দেয়া হয়, যার সাথে অন্য কারো তুলনা হতে পারে না। মৃত্যুকে তারা ভয় পায় না। তাদেরকে ভাল করেই বুঝিয়ে দেয়া হয়, মরণ সাগরে যারা ঝাঁপ দিতে পারে, মরণকে কেবল তারাই জয় করতে পারে। তাই তারা সহজে পরাজিত হয় না।

লিজাকে উঠিয়ে আনার জন্য ওদের পাঠিয়েছিল সে। তারা লিজাকে ধরে আনতে পারেনি ঠিক, কিন্তু কারিশমাকে উঠিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছে। লিজাকে হারানোর বেদনা কারিশমাকে দিয়ে দূর করা কি সম্ভব? না কিছুতেই তা নয়, অনুভব করলো শেখ মান্নান। যদিও কারিশমা সুন্দরী, রূপসী কিন্তু লিজার চোখে যে নিবেদনের আর্তি আছে, মায়াময় মোহনীয়তা আছে, জৌলুসহীন অন্তরঙ্গতা আছে, তা কোথায় পাবে কারিশমা! তার চোখে যে মাদকতা আছে সেখানে আছে জৌলুসের সমারোহ, আছে অভিজ্ঞতার প্রলেপ ও চাতুর্যের সজীবতা। কিন্তু লিজার সহজ সরল নমনীয়তা ও ভীতিময় নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে যে নিবেদনের আর্তি ও বিহবলতা আছে তার কিছুই নেই সেখানে। দু'জনই সুন্দরী, কিন্তু সেই সুন্দরের মধ্যে কি যোজন যোজন দূরত্ব! কল্পনায় লিজার সেই বিমুগ্ধ রূপের কথা স্মরণ করে অস্থির চিত্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শেখ মান্নান।

লিজাকে মুঠোর মধ্যে পেয়েও ভোগ করতে পারেনি এর জন্য শেখ মান্নান দায়ী করল কারিশমাকে। কারিশমা বাঁধা না দিলে তার অন্তরের চাহিদা এতক্ষণ অপূর্ণ থাকতো না। লিজা

নেই, লিজাকে না পাওয়ার প্রতিশোধ এখন কারিশমার কাছ থেকেই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কিভাবে? কি শাস্তি দিলে তার অন্তরের জ্বালা দূর হবে?
বারান্দায় দীর্ঘক্ষণ পায়চারী করেও এর কোন ফায়সালা করতে পারল না শেখ মান্নান। তখন প্রহরীকে ডেকে বললো, 'কারিশমাকে কারাগারে পাঠিয়ে দাও।'

পড়ন্ত বেলা। আছিয়াত দূর্গের প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে প্রহরীরা বিকেলের মিঠে রোদের কোমল উত্তাপ উপভোগ করছে। কোন রকম ভয়ভীতি বা শঙ্কার লেশও নেই কারো চোখে। হঠাৎ তাদের নজরে পড়লো দূর দিগন্তে এক খণ্ড ধূলিঝড়. এ রকম ধূলিঝড় একাধিক কারণে সৃষ্টি হয়, কিন্তু কোনটাই সুখকর নয়। সব কারণের মধ্যেই ভয় ও আশঙ্কার বার্তা থাকে। ওরা লক্ষ্য করলো, ধূলিঝড়টি আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে এবং এদিকেই এগিয়ে আসছে। ওরা অজানা আশঙ্কা নিয়ে তাকিয়ে রইল সেই ধূলিঝড়ের দিকে।
সময় গড়িয়ে চলল। ওরা অনুভব করল, এটা মরু সাইমুম নয়, কোন কাফেলার দূরন্ত অশ্বখুরের আঘাতে সৃষ্ট বালির সমুদ্র যেন উড়ে আসছে ওদের দিকে। প্রহরীরা এই নিয়েই কথা বলছিল। এত বড় কাফেলা এদিকে কেন আসছে? ওরা কি শত্রু, না মিত্র? ওরা এসব বলাবলি করছে আর তাকিয়ে দেখছে ঝড়ের গতি।
তখনো ধূলিঝড় অনেক দূরে। দূর থেকেই ওরা দেখতে পেল শত শত অশ্বারোহী ছুটে আসছে কেল্লার দিকে। প্রহরীরা

বিলম্ব না করে নাকারা বাজিয়ে দিল। নাকারার আওয়াজ কানে যেতেই কেল্লার কমাণ্ডারর৷ ছুটল উপরে। প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে ওরাও দেখলো সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্য। সঙ্গে সঙ্গে ওরা আবার নিচে নেমে গেল এবং নিজ নিজ বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হুকুম দিল।

হুকুম দিয়েই ওরা আবার ছুটল প্রাচীরের ওপরে। ততক্ষণে ধূলিঝড় আরো অনেক কাছে চলে এসেছে। ওরা নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে কেল্লার ভেতরে ও প্রাচীরের ওপর পজিশন নিল। ছুটে আসা সৈন্য বাহিনী কেল্লার কাছে এসেই কেল্লার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং কেল্লা অবরোধ করে দাঁড়িয়ে গেল।

শেখ মান্নান মোকাবেলার আদেশ দিয়ে বলল, 'বড় তাজ্জব ব্যাপার! ফেদাইন বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে এসে আবার কার মরার শখ হল!'

তার হুকুমে কেল্লার প্রাচীরের ওপর তীরন্দাজ বাহিনী পজিশন নিয়ে বসে গেল। শেখ মান্নান বলল, 'এখনি তীর বর্ষণের দরকার নেই। আগে দেখে নিই কাদের এ দুঃসাহস হলো।'

প্রাচীরের ওপর পজিশন নেয়া তীরন্দাজরা তীর বর্ষণ না করে চুপচাপ বসে রইল। তারা লক্ষ্য করতে লাগলো, আক্রমণকারীদের গতিবিধি।

সুলতান আইয়ুবী কেল্লার ভেতরের সব রকম তথ্যই পেয়ে গিয়েছিলেন আন নাসেরের কাছ থেকে। আন নাসের নিজেও সৈন্য দলের সাথে ছিল, সে সুলতানকে জানাচ্ছিল কেল্লার কোথায় কি আছে।

সুলতানের নির্দেশে দু'টি মিনজানিক কামান সেট করা হলো। আন নাসের শেখ মান্নানের মহলটি কোথায় ও কতটা দূরত্বে দেখিয়ে দিল কামান চালকদের।

তাঁর নির্দেশিত স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে একটা পাথর নিক্ষিপ্ত হলো মিনজানিকের সাহায্যে। পাথরটি যথাস্থানেই আঘাত হানলো, মান্নানের মহলের দেয়াল ফুটো হয়ে গেল সে আঘাতে। আর অপেক্ষা করার উপায় নেই। কারা আক্রমণ করেছে বুঝে নিয়েছে শেখ মান্নান।

আইয়ুবীর কমাণ্ডোদেরকে গুমাস্তগীনের কাছে বিক্রি করে যে ভুল আমি করেছিলাম তার প্রায়শ্চিত্ত করার সময় হয়ে গেছে, ভাবলো শেখ মান্নান। সে তার সৈন্যদের এ হামলার জবাব দেয়ার নির্দেশ দিল।

কেল্লার উপর থেকে শুরু হলো তীর বর্ষণ। কিন্তু সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা তখনো তীরের আওতার বাইরে। শেখ মান্নানের ফেদাইন বাহিনীর তীর বর্ষণ কোনই কাজে এল না, আইয়ুবীর একজন সৈন্যও আহত হলো না তাতে।

আইয়ুবীর নির্দেশে এবার কেল্লার মধ্যে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করলো মিনজানিকের কমাণ্ডার। বোমা শেখ মান্নানের মহলের অনতিদূরে গিয়ে ফাটলো। বোমা ফেটে চারদিকে ছড়িয়ে গেল পেট্রোল। কিন্তু তাতে কেল্লার কোন ক্ষতি হলো না। শেখ মান্নান বা ফেদাইনরা বুঝতে পারল না, এ বোমা হামলার মাধ্যমে তাদের জন্য কত বড় বিপদ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে কেল্লার ভেতর।

আইয়ুবী এবার সেখানে আগুন লাগানো তীর নিক্ষেপের হুকুম

দিলেন। তীরন্দাজ মুজাহিদরা তীর ছুঁড়লো, কিন্তু পেট্রোলের কাছে নিতে পারলো না কোন তীর। তীর সেখানে নিতে হলে তাদেরকে কেল্লার আরো কাছাকাছি যেতে হবে। যেখানে এখন তারা পজিশন নিয়ে আছে সেখানে থেকে লক্ষ্যস্থলে তীর কিছুতেই পৌঁছানো সম্ভব নয়।

আইয়ুবী পুরো বিষয়টি গভীরভাবে লক্ষ্য করলেন। তিনি তীরন্দাজদের বললেন, 'শাহাদাতের পেয়ালা পান করতে আগ্রহী এমন তিনজনকে এ মুহূর্তে আমার দরকার। কারা এ দায়িত্ব নিতে চাও?'

সঙ্গে সঙ্গে পাশের সব ক'জন তীরন্দাজ, যারা আইয়ুবীর আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল, উঠে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি ওদের মধ্য থেকে তিনজনকে বেছে নিলেন।

তিনি তাদের বললেন, 'পেট্রোল ভেজা জায়গায় তীর পৌঁছতে পারে এমন দূরত্বে এগিয়ে তীর ছুঁড়বে তোমরা। আমি আবার তীর ছোঁড়ার হুকুম দেয়ার সাথে সাথে তোমরা ছুটে যাবে পাঁচিলের দিকে। আমাদের তীর তোমাদের কাভার দেয়ার চেষ্টা করবে। দুশমনের তীর আঘাত হানলেও আশা করি তোমরা তোমাদের দায়িত্ব সফলতার সাথেই সমাধা করতে পারবে।'

সুলতান আবার তীর ছোঁড়ার হুকুম দিতেই ওই তিন তীরন্দাজ ছুটল পাঁচিলের দিকে। বেশী দূর যেতে পারেনি, তার আগেই দুশমনের তীর ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের ওপর। হুমড়ি খেয়ে পড়ার আগে এক তীরন্দাজ তার তীরে আগুন জ্বেলে কোন মতে ছুঁড়ে মারল। সৌভাগ্যক্রমে তাতেই কাজ হল। তীরটি

দেয়াল অতিক্রম করে গিয়ে পড়ল পেট্রোলের ছিটকে পড়া কোন অংশে, তাতেই আগুন ধরে গেল সেখানে।
সহসা সে আগুন নিকটেই পেট্রোলের মূল অংশ স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। মুহূর্তে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। শেখ মান্নানের মহল ভরে গেল সে অগ্নিশিখায়। আইয়ুবী আরও কয়েকটি মিঞ্জানিক বোমা নিক্ষেপ করার হুকুম দিল। সাথে সাথে পালিত হলো সে হুকুম। বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল প্রজ্জ্বলিত আগুনের শিখা।
আছিয়াত দূর্গে তখন চরম এক অবস্থা। শেখ মান্নানের লোকেরা গুপ্তঘাতক হিসাবে খ্যাতিমান ছিল। তাদের যত বীরত্ব সব ছিল নিঃসঙ্গ মানুষের ওপর। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে দক্ষ হলেও সম্মুখ যুদ্ধের ট্রেনিং তাদের ছিল না। তার ওপর এই অতর্কিত অগ্নির ছোবল ছিল তাঁদের ধারনার বাইরে। ফলে অচিরেই তারা অনুভব করল, কেয়ামতের বিভীষিকা শুরু হয়ে গেছে তাদের উপর দিয়ে।
শেখ মান্নানের অবস্থা আরও করুণ। তার মনে হলো, হাবিয়া দোযখের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে। চারদিকে দাউ দাউ আগুন। সে আগুন সবকিছু গ্রাস করে নিচ্ছে। হয়তো কিছুক্ষণ পর তাকেও গ্রাস করে ফেলবে।
তার সৈন্যদের কারো অবস্থায়ই এমন নয় যে, তারা আইয়ুবীর বাহিনীর মোকাবেলা করে। যারা পাঁচিলের ওপর ছিল তারা নেশাগ্রস্ত মানুষের মত ঘোরের মধ্যে তখনো তীর চালিয়ে যাচ্ছিল। নিচের সৈন্যরা আচ্ছন্ন হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে

দেখছিল অগ্নিশিখার তাণ্ডব। আগুনের হাত থেকে বাঁচার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছিল এখান থেকে ওখানে।

শেখ মান্নান যুদ্ধের বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিল। কেল্লার উপরে সাদা পতাকা উড়িয়ে দিল সে। সুলতান আইয়ুবী যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। থেমে গেল দু'পক্ষের তীরবৃষ্টি।

তীরবৃষ্টি থামতেই চারদিক নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। রোদের উত্তাপ আগেই কমে গিয়েছিল, এখন এই নীরবতার মধ্যে চুপিসারে এসে হানা দিল সন্ধ্যার অন্ধকার।

সুলতান আইয়ুবীর নির্দেশে এক সালার সেই নীরবতা ভঙ্গ করে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করল, 'শেখ মান্নান, সুলতান তোমাকে আত্মসমর্পণের সুযোগ দিচ্ছেন। কেল্লা থেকে বেরিয়ে এসে তোমাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে।'

কিছুক্ষণ পর। কেল্লার দরজা খুলে গেল। শেখ মান্নান দু'তিনজন সেনাপতি ও কমাণ্ডারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল। সুলতান আইয়ুবী অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে তাদের স্বাগত জানালেন। সাধারণত কোন কেল্লাধিপতিকে যেভাবে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে বরণ করা হয়, তেমন কোন উৎসাহ বা ঘটা দেখালেন না সুলতান। কারণ সুলতানের কাছে মান্নান কোন যোদ্ধা বা বীর ছিল না, ছিল এক জঘন্য পাপী ও খুনী।

তারা যখন সুলতান আইয়ুবীর কাছে এল, তিনি তাদের বসতেও বললেন না। সুলতান তার তাবুর সামনে এক আসনে বসেছিলেন। আইয়ুবীর দুই সেনাপতি শেখ মান্নান ও তার সঙ্গীদেরকে হাজির করলো সুলতানের সামনে।

'মান্নান!' সুলতান আইয়ুবী গম্ভীর স্বরে বললেন, 'এখন তুমি

কি চাও?'
'প্রাণ ভিক্ষা চাই!' শেখ মান্নান পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে উদাস ভঙ্গিতে বললো।
'আর তোমার দূর্গ?' সুলতান আইয়ুবী জিজ্ঞেস করলেন।
'আপনার যে সিদ্ধান্ত তাই মেনে নেবো।'
'তোমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে এক্ষুণি বেরিয়ে যাও।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'তোমরা কোন জিনিস সঙ্গে নিতে পারবে না। তোমার বাহিনীকে গুছিয়ে নাও, কোন সেনা কমাণ্ডার ও সৈন্যের কাছে অস্ত্রশস্ত্র থাকতে পারবে না। এখান থেকে সম্পূর্ণ খালি হাতে বের হয়ে যাবে তোমরা। তোমার কয়েদখানায় যেসব কয়েদী আছে, তাদের সেখানেই থাকতে দাও। আর স্মরণ রেখো, ইসলামী সাম্রাজ্যের কোন সীমানাতেই যেন তোমাকে না দেখি। সোজা খৃস্টানদের সীমানায় গিয়ে থামবে। তোমাকে এ যাত্রা মৃত্যুদণ্ড দিলাম না, কিন্তু ইসলামী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আর কোন চক্রান্ত বা অপকর্ম করলে তার যথাযথ সাজা তোমাকে ভোগ করতে হবে।'
তিনি আরো বললেন, 'তুমি যে চারজন ফেদাইনকে পাঠিয়েছিলে আমাকে হত্যা করার জন্য, তারা সবাই নিহত হয়েছে। তুমি সাদা পতাকা উড়িয়েছো বলে এবারকার মত তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। আমি কুরআনের নির্দেশের অনুসারী। আমি বলতে পারি না, খোদা তোমাকে ক্ষমা করবেন কি না। কিন্তু আমি বলছি, তুমি এবং তোমার ফেদাইন খুনীরা যদি

নিজেদের মুসলমান হিসাবে দাবী করা ত্যাগ না করো তবে তোমাকে ও তোমার দলকে আমি ভূমধ্যসাগরে ডুবিয়ে দিতে বাধ্য হবো।'

সূর্য ডুবতে বসেছে। সন্ধ্যার লালিমায় বিষণ্নতার ছোঁয়া। মানুষের আবছা সুদীর্ঘ ছায়া মাথা নত করে দিগন্তের পাড়ে চলে যাচ্ছে। সেই ছায়া শেখ মান্নানের। মান্নান একা নয়, তার সাথে আছে তার এতদিনের সহচরবৃন্দ। নতমুখী মানুষের দীর্ঘ মিছিল হারিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টির অন্তরালে। সেই মিছিলের পুরোভাগে নেতৃত্ব দিচ্ছে শেখ মান্নান। পরাজিত মানুষের অভিনব এক কাফেলা। কাফেলায় শরীক হয়েছে নানা বিচিত্র অপরাধী। কেউ খুনী, কেউ মাদক ও নারীর দালাল, কেউ ছিনতাইকারীদের সর্দার, কেউ প্রতারক ও ফেরেববাজ, কেউ লুটেরাদের নেতা, কেউ সম্মোহন বিদ্যায় পারদর্শী গণক ও ভাগ্য গণনাকারী। এদেরই কেউ গুপ্তঘাতক দলের সেনাপতি, কেউ কমাণ্ডার ও সৈন্য।
পেশাদার খুনীরা মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে। মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে অপরাধ জগতের রথী মহারথীরা। এটা স্বপ্ন না বাস্তব এই দ্বিধায় ভুগছে এখনো কেউ কেউ। তাদের এই দ্বিধার কারণ তাদের অন্তরে লুকিয়ে থাকা অপকর্মের দীর্ঘ ফিরিস্তি। কারণ তারা জানে, তারা এমন সব অপরাধ করেছে, যার কোন ক্ষমা নেই। যদি সেই অপরাধের শাস্তি দেয়ার জন্যই আইয়ুবী এসে থাকে তাহলে তো তার উচিত ছিল

আমাদেরকে হত্যা করা। অথচ সে আমাদের গায়ে ফুলের টোকাটি পর্যন্ত দেয়নি। আবার ভাবছিল, আমরা কি তারা, যাদের ভয়ে রাজা উজির আমীরদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়!

এসব ভাবতে ভাবতেই সন্ধ্যার অন্ধকারে হারিয়ে গেল দুর্ধর্ষ ফেদাইন সন্ত্রাসীরা। দুর্ভাগ্য তাদের, যাওয়ার সময় তারা কিছুই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি। তাদের উট, ঘোড়া, অস্ত্র, মানুষকে মোহগ্রস্ত করার নানা সরঞ্জাম, আসবাবাদি সব কিছু কেল্লার মধ্যে ফেলেই তাদের পথে নামতে হয়েছে।

সূর্য পরিপূর্ণভাবে অস্ত যাওয়ার আগেই সুলতান আইয়ুবীর সেনাবাহিনী দূর্গের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে নিল। কারাগার থেকে বের করে আনা হল কয়েদীদের। শেখ মান্নানের মহল ও কেল্লার গুপ্ত কক্ষ থেকে উদ্ধার করা হল বেশুমার সোনা, রূপা, হীরা, জহরত ও অফুরন্ত মণিমাণিক্য।

০

সুলতান আইয়ুবী এই কেল্লাকে একজন সেনাপতির দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ে সেই রাতেই কোহে সুলতানে যাত্রা করলেন। তিনি এখন আর বেশী দেরী করতে চান না। পরিকল্পিত অবশিষ্ট কাজগুলো যত দ্রুত সম্ভব সমাধা করে ফেলতে চান।

কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি নতুন অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। অভিযানের শুরুতেই আচমকা এক রাতে তিনি এজাজ দুর্গ অবরোধ করে বসলেন। হলবের আমীর এজাজ দুর্গকে

শক্তিশালী ঘাঁটি হিসাবে গড়ে তুলেছিল। কারণ এই ঘাঁটিই হলব শহর ও প্রদেশের প্রধান প্রতিরক্ষা ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল।

হলবের আমীর তার সেনাবাহিনীর মূল শক্তিকেন্দ্র হিসাবে এজাজ দূর্গকে গড়ে তোলার ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এই ঘাঁটির সব সৈন্য ছিল তারুণ্যে উচ্ছল ও প্রাণবন্ত। সবাই ছিল ক্লান্তিহীন, সতেজ ও সবল। তিনি এই বাহিনীকে আইয়ুবীর মোকাবেলা করার জন্য উপযুক্ত ট্রেনিং ও পর্যাপ্ত রসদ সরবরাহ করে রেখেছিলেন। কিন্তু এই সৈনিকদের অধিকাংশই ছিল এমন, পর্যাপ্ত ট্রেনিং পেলেও যুদ্ধের ময়দানে সরাসরি লড়াই করার অভিজ্ঞতা যাদের ছিল না।

সুলতান আইয়ুবী জানতেন তাদের রণপ্রস্তুতির কথা। বিশেষ করে সুলতানের দূতকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়ে তারা যে দুঃসাহস দেখিয়েছিল, তাতে তাদের সাহস ও শক্তির অহংকারই মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাই এ কেল্লা খুব সহজেই দখল করতে পারবেন, তেমনটি সুলতান আশাও করেননি। তিনি জানতেন, এজাজ দূর্গে তিনি তুমূল প্রতিরোধের সম্মুখীন হবেন। তাই কেল্লাটি দখল করার মত পর্যাপ্ত রণপ্রস্তুতি নিয়েই তিনি এখানে এসেছিলেন।

এ কেল্লা অবরোধ করার মধ্যে একটি সামরিক ঝুঁকি বিদ্যমান ছিল, সুলতান সে বিষয়টিও নজরে রেখেছিলেন। এই ঝুঁকি হচ্ছে, হলবের সেনাবাহিনী। তিনি কেল্লা অবরোধ করে বসে থাকলে আত্মসমর্পণ না করে কেল্লার কোন সৈনিক বাইরে আসতে পারবে না ঠিক, কিন্তু পিছন থেকে হলবের

সেনাবাহিনী আক্রমণ করে বসতে পারে। তাই তিনি এমন একটি ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, যাতে হলব থেকে কোন বাহিনী এলে তাদেরও উপযুক্ত আদর-আপ্যায়নে কোন ত্রুটি না ঘটে।

সুলতান আইয়ুবীর একটা সুবিধা ছিল এই, তুর্কমান রণাঙ্গণ থেকে সম্মিলিত বাহিনীর সাথে হলবের বাহিনীও চরম পরাজয় স্বীকার করে হতোদ্যম ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেছিল। তাদের এখন যুদ্ধ করার সাহস, শক্তি ও মনোবল কিছুই অবশিষ্ট নেই।

এজাজ দুর্গ। হলবের অনুগত বাহিনী জীবন বাজি রেখে লড়াই করে চলেছে। এজাজ দূর্গ রক্ষার সাথে জড়িয়ে পড়েছে তাদের জীবন-মরণ। পুরো একটা দিন ও রাত তারা সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যদেরকে কেল্লার কাছে আসতে দেয়নি। প্রাচীর ভাঙার জন্য যে দলটিকে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিলেন সুলতান, অনেক চেষ্টা করেও দেয়ালের কাছে যেতে পারেনি তারা। কারণ প্রাচীরের ওপর থেকে এমন প্রবল বেগে তীর বর্ষিত হচ্ছিল, জীবন বাজি রেখে চেষ্টা করেও দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয় কারো পক্ষে, তার আগেই তীরের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে তার বুক। তাই নিস্ফল ঝুঁকি নেয়ার মধ্যে কোন কল্যাণ খুঁজে পায়নি দলটি।

পরের দিন। সুলতান আইয়ুবী অবরোধ তীব্রতর করার কথা ভাবলেন। তিনি তাঁর বাহিনীর অফিসার ও কমাণ্ডারদের ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে বললেন, 'কালকের চেয়ে আজকের

আক্রমণ আরেকটু জোরালো করো, যাতে ওরা উপলব্ধি করতে পারে, সময় যত যাবে ততই কঠিন হবে ওদের বেঁচে থাকা। আমি ওদের হত্যা করার পরিবর্তে আত্মসমর্পণ করাতে চাই। তোমাদের টার্গেট হবে ওদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা।'

সেনাবাহিনী সুলতানের নির্দেশ মোতাবেক কাজে নেমে পড়ল। শক্তিশালী মিঞ্জানিক দ্বারা ভারী ভারী পাথর নিক্ষেপ করে, পেট্রোল ভর্তি হাঁড়ি নিক্ষেপ করে এবং সেই পেট্রোলে অগ্নি-তীর বর্ষণ করে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আইয়ুবীর সৈন্যরা দুর্গ এবং দুর্গ-প্রাচীরে এক ভয়াবহ ত্রাসের পরিবেশ তৈরী করে ফেলল।

প্রাচীরের উপরের তীরন্দাজরা অনেকেই আগুনে ঝলসে গেল। কেউ কেউ কেল্লার ভেতর লাফিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করল। কেল্লার ভেতর অগ্নিশিখা কতটা বিস্তৃত হলো দেখার উপায় না থাকলেও প্রাচীরের অবস্থা আইয়ুবীর সৈন্যরা সচক্ষে দেখতে পাচ্ছিল। প্রাচীরের ওপর জায়গায় জায়গায় যেসব সেন্ট্রিবক্স ছিল সেখানে থেকে তখনো কিছু তীরন্দাজ প্রাণপণে তীর ছুঁড়ে যাচ্ছিল।

এমন সময় পেট্রোল বোঝাই একটি হাড়ি গিয়ে পড়ল কেল্লার একদম গেটের কাছাকাছি। কিছু পেট্রোল পড়লো পাঁচিলে, কিছু ছিটকে গিয়ে পড়ল গেটে। আইয়ুবীর তীরন্দাজরা সেই পেট্রোলে অগ্নি-তীর ছুঁড়ে মারল। সাথে সাথে সেখানে জ্বলে উঠল দাউ দাউ আগুন। পাঁচিল থেকে সে আগুন লাফিয়ে পড়ল কেল্লার গেটে। জ্বলতে শুরু করলো কেল্লার প্রধান ফটক।

এই সুযোগে প্রাচীর ভাঙা বাহিনী ছুটল পাঁচিল ভাঙতে। কিন্তু সেন্ট্রিবক্স থেকে বেপরোয়া তীর বর্ষণ করে তাদের অনেককেই শহীদ করে দিল এজাজের দূর্গ রক্ষীরা।

কেল্লার ভেতর অগ্নিগোলা নিক্ষেপের জন্য মিঞ্জানিক চালকদের কয়েকজন মিঞ্জানিক পাঁচিলের আরো কাছাকাছি নিয়ে গেল। এদের উপরও বেপরোয়া তীর চালাল পাঁচিলের ওপর থেকে কয়েকজন তীরন্দাজ। এতে বেশ কিছু মিঞ্জানিক চালক ও সৈন্য আহত এবং শহীদ হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে ওরা আবার মিঞ্জানিক পিছনে সরিয়ে নিয়ে এল।

সুলতান আইয়ুবী সবকিছু তদারক করছিলেন। তিনি মিঞ্জানিক চালকদেরকে খুব সতর্কতার সাথে সেন্ট্রিবক্স টার্গেট করতে বললেন। তাই করা হলো। দেখা গেল দুটি সেন্ট্রিবক্স ভারী পাথরের আঘাতে গুড়িয়ে গেল। সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল ওখান থেকে তীর আসা।

এবার আরেকদল পাঁচিল-ভাঙা সৈনিক ছুটল গেটের দিকে। শন শন করে অন্য সেন্ট্রিবক্স থেকে ছুটে এল কয়েকটি তীর। কয়েকজন মুজাহিদ লুটিয়ে পড়ল ময়দানে। বাকীরা সঙ্গীদের লাশ পেছনে ফেলেই এগিয়ে গেল সামনে। কারণ তারা বুঝে গিয়েছিল, এমন কিছু কুরবানী ছাড়া কেল্লা দখল করা সম্ভব নয়। একজন শহীদ হলে সেখানে ছুটে যেতো আরো কয়েকজন জিন্দাদীল মুজাহিদ।

আইয়ুবী বুঝতে পারলেন, লড়াই একটি পরিণতির দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। আক্রমণ আরেকটু তীব্রতর করতে পারলে লড়াই আগামী কালের জন্য মূলতবী করার প্রয়োজন পড়বে

না।

কেল্লার গেট তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। লোহার ফ্রেম থেকে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে কাঠের জ্বলন্ত টুকরা। ওদিকে সুলতানের আদেশ পেয়ে সমানে পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল মিঞ্জানিক চালকরা। তীরন্দাজরা এগিয়ে টার্গেট স্থির করে তীর বর্ষণ শুরু করে দিল। তারপরও কেটে গেল বেশ কিছুটা সময়।

একটু পর। আইয়ুবীর একদল জানবাজ গেটের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। তারা বন্ধুদের লাশ এবং জ্বলন্ত আগুনকে অগ্রাহ্য করে গেটের কাঠ খুলতে শুরু করে দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গেটের লোহার ফ্রেম ছাড়া উধাও হয়ে গেল সব কাঠ। এখন অনায়াসেই পদাতিক বাহিনীর সদস্যরা দুর্গে প্রবেশ করতে পারবে।

এ সুযোগটুকুর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন সুলতান। তিনি পদাতিক বাহিনীকে এগিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেন। এগিয়ে গেল পদাতিক বাহিনী।

ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে রাতের আঁধার। থেমে গেছে পাথর ও অগ্নিগোলা নিক্ষেপ। দাউ দাউ আগুনের প্রচণ্ডতা কমে গিয়ে এখানে ওখানে যে টুকরো টুকরো অগ্নিশিখা জ্বলছে তাতে কেল্লার ভেতরের অন্ধকার যেন আরো গাঢ় হয়ে উঠল। কারণ সে আগুন সামান্য এলাকা আলোকিত করে পাশের অন্ধকারকে আরো ঘন অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচ্ছিল।

গেটে তখনো লোহার ফ্রেমটুকু রয়ে গিয়েছিল। যে কারণে ওখান দিয়ে অশ্বারোহীদের প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। প্রাচীর

ভাঙার যে দলটি ওখানে পৌঁছে গিয়েছিল তারা লোহার ফ্রেম সরানোর চেষ্টা করছিল। এ সময় একদল পদাতিক অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সাঁ করে ভেতরে ঢুকে গেল। তাদের পেছন পেছন ঢুকল আরেকটি দল।

এজাজের দুর্গ রক্ষীরা ছাদের ওপর থেকে তাদের ওপর তীর বর্ষণ করছিল। কেউ কেউ লুটিয়ে পড়ছিল সে তীরের আঘাতে। বাকীরা ঢুকে যাচ্ছিল কেল্লার অভ্যন্তরে।

কেল্লার ভেতরে সৈনিকদের যে ব্যারাক ছিল তার সামনে সঙ্গীণ উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একদল কেল্লা রক্ষী। আইয়ুবীর পদাতিক বাহিনী হামলে পড়লো তাদের ওপর। রক্তক্ষয়ী তলোয়ার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল সেখানে।

পদাতিক বাহিনীর জানবাজ সৈন্যরা প্রাণপণে লড়াই করে চলেছে। ততক্ষণে গেটের লোহার ফ্রেমটি সরিয়ে ফেলতে সমর্থ হলো ওখানকার দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনী। সুলতান আইয়ুবী এবার সাঁড়াশী অভিযানের জন্য অশ্বারোহী দলকে এগিয়ে যাবার হুকুম দিলেন।

অশ্বারোহী বাহিনী খোলা গেট দিয়ে ঝড়ের বেগে ঢুকে গেল ভেতরে। এজাজ দুর্গের তীরন্দাজরা ছাদের ওপর থেকে তীরের বন্যা বইয়ে দিল। আইয়ুবীর বাহিনীর পদাতিক ও অশ্বারোহীদের লাশে ভরে গেল সামনের চত্বর। যুদ্ধের এ পর্যায়ে এসে এমন কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে, আইয়ুবীর বাহিনী এতটা ধারনা করেনি। তারা চরম কোরবানী দিয়ে যাচ্ছিল। লড়াই চলছিল তীব্রতর, দু'পক্ষেই হতাহত হচ্ছিল সমান তালে। আইয়ুবীর সৈন্যরা লাশ ডিঙ্গিয়ে

আরো ভেতরে প্রবেশ করলো।

এ যুদ্ধ ছিল বড় রক্ত ঝরা যুদ্ধ। এজাজ দুর্গের সৈন্যরা প্রচণ্ড সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে লড়াই করছিল। গেটের লৌহ কপাট ভেঙে পড়ায় দলে দলে অশ্বারোহী বাহিনী ভেতরে প্রবেশ করলো। প্রাণপণে প্রতিরোধ করেও ওদের অগ্রযাত্রা বন্ধ করতে পারল না এজাজের দুর্গরক্ষীরা।

সুলতান আইয়ুবী ভেতের প্রবেশ রত অশ্বারোহীদের হুকুম দিলেন কেল্লার মধ্যে স্থানে স্থানে আগুন লাগিয়ে দিতে। তাতে অন্ধকার কিছুটা কমবে। শত্রু-মিত্র চিনতে সুবিধা হবে। আর সবচে বড় ফায়দা যেটি হবে, তা হলো, সর্বত্র আগুন ধরিয়ে দিলে কেল্লার অভ্যন্তরে আতংক বৃদ্ধি পাবে। এখন ওরা ক্ষয়ক্ষতি প্রত্যক্ষ করতে পারছে না বলে যে সাহস ও মনোবল নিয়ে লড়াই করতে পারছে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমান দেখলে তাতে ভাটা পড়বে। কেল্লার সর্বত্র আগুন জ্বলতে শুরু করলে ওরা বুঝতে পারবে, আইয়ুবীর বাহিনী কেল্লার সবখানে অবস্থান নিয়ে ফেলেছে। হয়তো এরই মধ্যে তাদের কোন কোন সাথী আত্মসমর্পণও করে ফেলেছে।

এই চিন্তা একবার কারো মনে ঢুকে গেলে সে নিজেও আত্মসমর্পণের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে।

সঙ্গে সঙ্গে সুলতানের নির্দেশ কার্যকর করা হলো। কেল্লার বিভিন্ন স্থাপনার ওপর আগুন লাগিয়ে দিল আইয়ুবীর বাহিনী। এতক্ষণ এজাজ দুর্গের যে সেনাদল বীরত্ব নিয়ে লড়াই করছিল, তারা দেখতে পেল, তাদের অস্ত্রাগারে আগুন জ্বলছে। আগুন জ্বলছে ঘোড়ার আস্তাবলে, খাদ্যগুদামে,

তাদের থাকার ব্যারাকে, এমনকি অফিসার্স কোয়ার্টারে। পশুর জন্য রাখা শুকনো ঘাস ও খড়ের গুদামের আগুন আকাশ আলোকিত করে ফেলেছে।

এ কেল্লাটি হলব শহর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। রাতে হলববাসী দেখলো, এজাজ দুর্গের যেখানে সেখানে আগুন আর আগুন। আগুনের সেই লেলিহান শিখায় পাক খাচ্ছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। আকাশ লাল করে সে ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে। একটার পর একটা অগ্নিশিখা কেবল বাড়ছেই। মনে হচ্ছে, এজাজ দুর্গে আগুনের রাজত্ব কায়েম হয়েছে।

সুলতান আইয়ুবী এজাজ দুর্গ অবরোধ করেছেন, হলববাসী এ সংবাদ আগেই পেয়েছিল। এই দৃশ্য দেখে হলবের সেনাবাহিনী প্রধান চিন্তায় পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেনানায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। বললেন, 'অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না। আইয়ুবীর বাহিনী নিশ্চয়ই এজাজ দুর্গে ঢুকে পড়েছে। এখন তাদের সাহায্যে আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত। আমরা আইয়ুবীর বাহিনীর পিছন থেকে আঘাত করলে সে উভয় সংকটে পড়ে যাবে। দু'দিক থেকে আক্রান্ত হলে তার অবস্থা হবে করুণ। চাই কি সে আত্মসমর্পণও করে বসতে পারে।'

কেউ কেউ এ প্রস্তাব সমর্থন করলেও অধিকাংশ সেনাপতি এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করল। তাদের একদল বলল, 'এজাজ দুর্গ নয়, এখন আমাদের নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করা উচিত। আইয়ুবী এজাজ দুর্গ দখল করে বসে থাকবে না। সে

অবশ্যই হলব আক্রমণ করবে। তার হলব প্রবেশ কি করে রোধ করা যায়, এটিই এখন মস্ত ভাবনার বিষয়।'
সেনাপতি বললো, 'সে জন্যই তো আমি এই মুহূর্তে তাকে পিছন থেকে চ্যালেঞ্জ করে বসতে চাই। সে এজাজ দুর্গে পরাজিত হলে কখনো হলব আক্রমণ করতে পারবে না।'
'কিন্তু আমরা শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে আরো বড় বিপদ হতে পারে।' বলল এক সেনাপতি, 'তাঁর কোন বাহিনী এই মুহূর্তে শহরের বাইরে ওঁৎ পেতে বসে নেই, এমন নিশ্চয়তা আমরা কেউ দিতে পারবো না। সে ক্ষেত্রে আমরা শহর থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে ওরা শহরে ঢুকে পড়বে। বিনা বাঁধায় ও বিনা যুদ্ধে ওরা এই শহর দখল করে নেবে। এমন সুযোগ আমরা ওদের কিছুতেই দিতে পারি না।'
'আমি ভাবছি অন্য কথা।' বলল আরেক সেনাপতি। 'আমাদের বাহিনী এইমাত্র একটা রক্তাক্ত লড়াই থেকে ফিরল। আইয়ুবীর হাতে চরম মার খেয়ে পরাজিত ও বিপর্যস্ত অবস্থায় ফিরে এসেছে ওরা। তারা আহত, রক্তাক্ত ও ক্লান্ত। তাদের মধ্যে এখনো বিরাজ করছে আইয়ুবী আতঙ্ক। ওরা এখন যুদ্ধ করার যোগ্য নেই। এ অবস্থায় আমরা চাইলেও ওদেরকে এখন আইয়ুবীর বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারবো না। এজাজ দুর্গের তাজাদম সৈন্যরাই যদি নিজেদের ভাগ্যের বিপর্যয় রোধ করতে না পারে তবে আমাদের এ হতোদ্যম বাহিনী কি করে ওদের রক্ষা করার জিম্মা নেবে?'
সুলতান আইয়ুবী যখন এজাজ দুর্গ অবরোধ করেন তখন আল মালেকুস সালেহের বয়স তেরো কি চৌদ্দ। এখন আর সে

শিশু নয়। শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ হয়েছে তার বয়স। কিছু কিছু বুঝতে শিখেছে রাজনীতির খেলা।
হলবে নিজের প্রাসাদে বসে সে দেখলো এজাজ দুর্গের লেলিহান আগুনের শিখা। যা বুঝার বুঝে নিল সে।
সে সময় সাইফুদ্দিন এবং গুমাস্তগীনও হলবেই ছিল। গতকালের ঘটনা মনে পড়ে গেল তার। আইয়ুবী এজাজ দুর্গ অবরোধ করেছে এ খবর যখন হলবে পৌঁছে তখন এ দু'জনই দরবারে ছিল। এজাজ দুর্গের অবস্থা ও করণীয় নিয়ে দু'জনের মধ্যে তর্ক বেঁধে যায়। এই বিতর্ক এমন তিক্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, গুমাস্তগীন সাইফুদ্দিনকে হত্যা করার হুমকী পর্যন্ত দেয়।
আল মালেকুস সালেহ ওদের এ বিতর্ক গভীর মনযোগের সাথে লক্ষ্য করে। গুমাস্তগীন এবং সাইফুদ্দিনের হাব-ভাব, আচরণ, চাহনী ও প্রতিটি কথা থেকে সে বুঝতে চেষ্টা করে ওদের দু'জনকে। ঝগড়ার এক পর্যায়ে সাইফুদ্দিন সম্মিলিত বাহিনীর সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয় এবং নিজের অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে হলব ত্যাগ করে চলে যাবে বলে জানায়।
আল মালেকুস সালেহ বুঝতে পারে, সম্মিলিত বাহিনীতে থাকলেও এরা আসলে একে অপরের শত্রু। গুমাস্তগীন যে আক্রোশ দেখালো, তাতে সে অনুভব করলো, এ লোকটি সুবিধের নয়, সে আসলে বন্ধুবেশী এক ষড়যন্ত্রকারী। অবশেষে সে এই ঝগড়ায় হস্তক্ষেপ করে এবং সাইফুদ্দিনকে আশ্বস্ত করার জন্য গুমাস্তগীনকে কারাগারে বন্দী করে। বন্দী

গুমাস্তগীন আল মালেকুস সালেহের বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্র পাকাতে শুরু করলে সে তথ্য,ফাঁস হয়ে যায়। আল মালেকুস সালেহ তখন তাকে কারাগারেই হত্যা করতে বাধ্য হয়।

এজাজ দুর্গ। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর শেষ পর্যন্ত দুর্গের সৈন্যরা অস্ত্রসমর্পণ করতে শুরু করল। এই অবরোধ ও যুদ্ধে সুলতান আইয়ুবীর বিজয় হলো বটে, কিন্তু এ বিজয়ের জন্য তাঁকে অনেক বেশী মূল্য দিতে হল। সেনা বাহিনীর যে দলটি প্রথম কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করেছিল, এ যুদ্ধে তাদের অধিকাংশই শাহাদাত বরণ করেছিল। এজাজের দুর্গ রক্ষীরা প্রমাণ করে দিয়েছিল, তারা কাপুরুষ বা ভীরু নয়।

এজাজ দুর্গ জয় করার পর সুলতান আইয়ুবী বিলম্ব না করে দ্রুত হলব শহর অবরোধ করে নিলেন। হলব শহর ছিল এজাজ দুর্গের খুবই সন্নিকটে। হলব শহরের সৈন্যরা রাতভর দেখেছে এজাজ দুর্গের বিভীষিকা। জ্বলন্ত আগুনের লেলিহান শিখা শুধু নয়, আহতদের আর্ত চিৎকারের ক্ষীণ আর্তনাদও তাদের অন্তরে ভয়ের শিহরণ বইয়ে দিয়েছে। অজানা শংকায় কেঁপেছে তাদের হৃদয়গুলো।

যুদ্ধ করার সব প্রেরণা ও সাহস তাতেই উবে গিয়েছিল। ভোরে যখন ওরা দেখতে পেল, কাল রাতে যারা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিল এজাজ দুর্গে, এখন তারাই এ শহর অবরোধ করে বসে আছে, ভয়ের হীমশীতল স্রোত তাদের কণ্ঠতালু পর্যন্ত শুকিয়ে ফেলল। তারা এজাজ দুর্গের রাতের বিভীষিকাময় দৃশ্যের কথা স্মরণ করে ভীতসন্ত্রস্ত

হরিণীর মত পালাবার পথ তালাশ করতে লাগল।
হলববাসীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল এ ভীতির শিহরণ। তারা আইয়ুবীর সাথে তাদের অতীত আচরণের কথা স্মরণ করে ভাবছিল আইয়ুবী না জানি তাদের জন্য কি কঠিন শাস্তি বরাদ্দ করে।
পালাবার সব পথ বন্ধ। শহরের চারদিক আইয়ুবীর সৈন্যরা ঘেরাও করে রেখেছে। এ অবস্থায় কিছুই করার নেই দেখে জনসাধরণ ঘরের ভেতর দরজা জানালা বন্ধ করে বসে বসে আল্লাহ আল্লাহ করতে লাগল। কারণ শহরের সেনাবাহিনী যে সুলতান আইয়ুবীকে প্রতিরোধ করার শক্তি হারিয়েছে সে কথা বুঝতে কারো কোন কষ্ট হচ্ছিল না। আইয়ুবী তাদের জন্য কি শাস্তি নির্ধারণ করে তাই দেখার জন্য দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগল শহরের প্রতিটি নাগরিক, এমনকি সৈন্যরা পর্যন্ত।

o

অবরোধের দ্বিতীয় দিন। আল মালেকুস সালেহের এক দূত এলো সুলতান আইয়ুবীর কাছে। দূত সুলতানের কাছে একটি চিঠি হস্তান্তর করল। সুলতান ভেবেছিলেন, আল মালেকুস সালেহ হয়তো কোন সন্ধি প্রস্তাব পাঠিয়েছে। কিন্তু চিঠি খুলে তিনি তাজ্জব হয়ে গেলেন। এটি কোন সন্ধি প্রস্তাব ছিল না, ছিল এক আবেগময় ছোট্ট চিরকুট, যা পড়ে সুলতান আইয়ুবী হতভম্ব হয়ে গেলেন।

চিঠিটা ছিল এমন: 'সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গী মরহুমের শিশু কন্যা সুলতান আইয়ুবীর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়।'

এই মেয়েটির নাম শামসুন নেছা। সে আল মালেকুস সালেহের ছোট বোন। বয়স মাত্র নয় কি দশ। আল মালেকুস সালেহ যখন দামেশক থেকে বিপথগামী আমীরদের প্ররোচনায় হলবে পালিয়ে আসে, তখন সে তার ছোট বোনকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তার মা মরহুম নূরুদ্দিন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী রাজিয়া খাতুন দামেশকেই থেকে যান। কারণ তিনি বিপথগামী আমীরদের ষড়যন্ত্র ধরতে পেরেছিলেন। সুলতান আইয়ুবীই যে মরহুম নূরুদ্দিন জঙ্গীর সত্যিকার অনুসারী এবং ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

সুলতান আইয়ুবী দূতকে নির্দেশ নিলেন, 'যাও, সেই মেয়েকে নিয়ে এসো।'

মরহুম নূরুদ্দিন জঙ্গীর কন্যা অনুমতি পেয়ে সুলতানের সামনে এসে হাজির হলো। তার সাথে এল আল মালেকুস সালেহের দুই সেনাপতি।

সুলতান আইয়ুবী তাকে কাছে পেয়েই বুকে টেনে নিলেন। তখন তাঁর হৃদয়ে বইছে আবেগের বন্যা। তিনি নূরুদ্দিন জঙ্গীর শিশু কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবেগে কেঁদে ফেললেন। অনেকক্ষণ মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখার পর কিছুটা শান্ত হয়ে মেয়েটিকে পাশে বসিয়ে বললেন, 'তোমরা কেমন আছো মা? তোমার ভাই ভাল আছে?'

মেয়েটি বিহবল কণ্ঠে বলল, 'আমরা ভাল আছি মামা। ভাইয়া

আপনাকে এ চিঠিটা দিতে বলেছে।' বলে সে ওড়নার ভেতর থেকে একটি চিঠি বের করে দিল। সুলতান চিঠিটি নিয়ে পড়লেন। তাতে আল মালেকুস সালেহ্ পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে লিখেছে, 'আজ থেকে আমি আপনার আনুগত্য স্বীকার করে নিলাম। বিপথগামী আমীরদের প্ররোচনায় এতদিন আপনার বিরোধীতা করে যে অন্যায় করেছি, সে জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। আমার কারণে ইসলামের অগ্রযাত্রায় যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল আপনার অধীনে বাকী জীবন কাজ করে আমি তার কাফফারা আদায় করতে চাই। আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, ইসলামের দুশমন, গাদ্দার গুমাস্তগীনকে হত্যা করা হয়েছে। এখন থেকে হারান কেল্লা ও তার রাজ্য আপনার অধীন। আশা করি আপনি আমাকে আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দেবেন।'

ইতি

আপনার স্নেহের 'সালেহ'।

চিঠি পড়ে সুলতান আইয়ুবী তাকালেন সালেহের পাঠানো দুই সেনাপতির দিকে। বললেন, 'তোমরা এই মেয়েটাকে কেন এখানে নিয়ে এসেছো? তোমরা কি এই পয়গাম নিজেরাই পৌঁছে দিতে পারতে না?'

সেনাপতি দু'জন এ প্রশ্নের কি জবাব দেবে বুঝতে পারল না। তারা একে অন্যের মুখের দিকে তাকাল। শেষে দু'জনেই তাকালো মেয়েটার দিকে। তখন মেয়েটিই এ প্রশ্নের জবাব দিল। বলল, 'মামুজান! এদের কোন দোষ নেই। আমাকে

ভাইয়াই পাঠিয়েছেন।'
'কেন, সে কি চায় আমার কাছে? তোমাকে কিছু বলেছে?'
'আপনি যদি এজাজ দুর্গটি ভাইয়ার হেফাজতে রাখেন এবং হলব শহরে তাকে থাকার অনুমতি দেন তাহলে ভাল হয়। ভাইয়া বলেছে, সে আর কোনদিন আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করবে না।'
সুলতান আইয়ুবী দুই সেনাপতির দিকে রাগতঃ দৃষ্টিতে তাকালেন। তার এ চাহনীর মানে হচ্ছে, 'তোমরা এসব শর্ত হাজির করার জন্য এ ছোট্ট মেয়েটিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার না করলেও পারতে! অতীতে আমি যেসব কেল্লা ও রাজ্য জয় করেছি, তার শাসকদের ওপর কি আমি জুলুম করেছি? আমি কি তাদেরকে উপযুক্ত মর্যাদা ও সম্মান দেইনি?'
'আমি এজাজ দুর্গ, হলব শহর এবং এ রাজ্য তোমাকেই দিয়ে যাচ্ছি শামসুন নেছা।' সুলতান আইয়ুবী ছোট মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'যাও, তোমার ভাইকে গিয়ে এ সুসংবাদ দাও।'
সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার সেনাপতিদের দিকে তাকিয়ে আদেশ জারী করলেন, 'এজাজ দুর্গ থেকে সব সৈন্য বের করে নাও এবং হলব শহরের অবরোধ উঠিয়ে নাও।'
এরপর তিনি হলবের সেনাপতিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি এজাজ দুর্গ এবং হলব রাজ্য ও শহর এই মাসুম মেয়েটাকেই শুধু দিয়ে যাচ্ছি। তোমরা কাপুরুষ, নির্লজ্জ ও গাদ্দার। তোমাদের আর সেনাবাহিনীতে থাকার অধিকার নেই।'

২৪শে জুন ১১৭৬ মুতাবেক ১৪ই জিলহজ্ব ৫৭১ হিজরী। আল মালেকুস সালেহের সাথে সুলতান আইয়ুবীর চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হলো। এই চুক্তিপত্রের বলে এজাজ দুর্গ ও হলব রাজ্য ইসলামী হুকুমাতের অধীন হয়ে গেল। হলবে আল মালেকুস সালেহকে সুলতানের অধীন শাসক হিসেবে গণ্য করা হলো।

এ চুক্তিপত্রের সময় মুশেলের আমীর সাইফুদ্দিন হলবেই ছিলেন। তিনিও সুলতান আইয়ুবীর আনুগত্য কবুল করে নিয়ে নিজের রাজ্য ইসলামী হুকুমাতের অধীন করে দিলেন।

এজাজ দুর্গের পতন, আল মালেকুস সালেহ ও সাইফুদ্দিনের আনুগত্য স্বীকার এবং গুমাস্তগীনের হত্যার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিরোধ ছিল তার অবসান হল। নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের যুগ শেষ হয়ে আপোস যুগের সূচনা হল। কিন্তু তাই বলে মুসলিম জাতির বুক থেকে ঈমান বিক্রয়কারী গাদ্দাররা নিঃশেষ হয়ে গেলো, এ কথা বলার অবকাশ তখনো তৈরী হয়নি। এক গাদ্দারের পরাজয় ও নিস্ক্রিয়তার শূন্যতা পূরণের জন্য দশ গাদ্দার দাঁড়িয়ে গেল। খৃস্টানদের ঈমান ক্রয়ের প্রয়োজন ও তৎপরতা আরো বেড়ে গেল। ষড়যন্ত্রের নিত্য-নতুন ক্ষেত্র তৈরীর জন্য মরিয়া হয়ে কাজে নামল ক্রুসেড বাহিনী।

হলবের একটি কবরস্থান। গোরস্তানটি অনেক বিস্তৃত। বিশাল মাঠ জুড়ে সারি সারি কবর। এর অধিকাংশ কবরই এখনও নতুন। কবরের উপরে যে মাটি ফেলা হয়েছে সে মাটিগুলোতে কোন যত্নের ছাপ নেই। এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সে মাটি। কোনটা উঁচু, কোনটা নিচু। কোনটা অন্যটার সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। কোন যুদ্ধের পর মৃত সৈনিকদের কবরগুলোর দশা ঠিক এমনটিই হয়।

হিম্মাত থেকে হলব পর্যন্ত এমন বিরাট আকারের আরো দু'টি গোরস্তান রয়েছে। তিনটি গোরস্তানেরই দশা ঠিক একই রকম। সদ্য দাফন করা শত শত লাশের সারি শুয়ে আছে নিশ্চুপ। এর ভেতরে যেসব লোকেরা শুয়ে আছে আজ আর তাদের কোন কাজ নেই। অথচ দু'দিন আগেও তাদের দাপটে পৃথিবীর মাটি কাঁপতো। হিংসা, দ্বেষ, হানাহানির জগত থেকে চির বিদায় ঘটেছে তাদের। দুনিয়ায় তারা যতটুকু ভাল ব মন্দ কাজ করেছে সেটুকুই আজ তার একমাত্র সম্বল। আমল তার সঙ্গ ছাড়েনি, তার সাথে সাথে তার কবরে গিয়ে ঢুকেছে।

হিম্মাতের ধূসর প্রান্তর আজ ছেয়ে আছে উদাসীনতায়। সেখানকার মাটি ও বাতাসে রক্তের গন্ধ। গন্ধ পচাঁ-গলা লাশের। সেই দুর্গন্ধে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। যেখানে সবসময় পাখির কিচির-মিচির ও সুমিষ্ট স্বর ভেসে বেড়াতো, সেখানে আজ শোনা যাচ্ছে শকুন ও শিয়ালের বিশ্রি

চিৎকার।

এমনি একটি করবস্থান ছিল হলব শহরের বর্ধিত এলাকা এজাজ দুর্গের পাশে। কবরের মাটি তখনও নতুন এবং ভেজা। কয়েকজন মুসল্লিসহ একজন ইমাম সেখানে দাঁড়িয়ে মৃতদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছিল। মোনাজাত শেষে তিনি যখন হাত মুখের উপর রাখলেন তখন দেখতে পেলেন, অশ্রুতে তার দাঁড়ি ভিজে একাকার হয়ে গেছে।

তিনি সমবেত মুসল্লিদের লক্ষ্য করে বললেন, 'এ অঞ্চল এখন অনাবাদী ও বিরাণ হয়ে যাবে। যেখানে একই কালেমা ও কুরআন পাঠকারীরা পরস্পর ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, সেখানে আল্লাহর গজব নেমে আসে। সেখানে একই রাসূলের অনুসারীরা পরস্পর খুনী সেজে বসে। যে মাটিতে ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের রক্ত ঝরে, সে মাটি বিরাণ ও মরুভূমি হয়ে যায়।'

মুসল্লিদের চেহারাগুলোতে বিষাদবিন্দু খেলা করছিল। সেই বেদনাবিধুর চেহারাগুলোর দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বললেন, 'এখানে দু'দিন আগেও তোমরা অহংকারের গর্জন ধ্বনি শুনেছ। অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনেছ। সেই সংঘাতে যারা জড়িয়ে পড়েছিল, তারা সবাই ছিল মুসলমান! এই যুদ্ধে যারা ইসলামের খাতিরে সত্যের প্রতি সমর্থন করে মারা গেছে, তারা শহীদের মর্যাদা ও সম্মান লাভ করবে। আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম মেহমান হিসাবে গণ্য হবে তারা। কিন্তু যারা বাতিলের সমর্থক হয়ে, কোন রাজা বা শাসকের আধিপত্য রক্ষার জন্য অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করে জীবন দিয়েছে, তারা কখনোই এই

মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না। এদেরকে যখন হাশরের ময়দানে উঠানো হবে তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে অবশ্যই এই রক্তপাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। তিনি যখন জানতে চাইবেন, তোমরা একই রাসূলের উম্মত হয়ে কেন একে অন্যের রক্ত প্রবাহিত করেছিলে? এই রক্ত যদি তোমরা ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে কুরবানী করতে তবে শুধু ফিলিস্তিন কেন, ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত তোমরা পৌঁছে যেতে পারতে। ইউরোপ আবার তোমাদের ঠিকানা হয়ে যেত। অথচ তোমরা তোমাদের জীবন ও রক্ত সব বৃথাই ব্যয় করলে?'

ইমাম সাহেব কথা বলছিলেন, এ সময় অনেক অশ্বের মিলিত পদধ্বনি শোনা গেল। ইমামের পাশে দাঁড়ানো কোন একজন বলে উঠলো, 'আমাদের সুলতান আসছেন।'

ইমাম সাহেব ঘুরে তাকালেন, দেখলেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আসছেন। তার সঙ্গে কয়েকজন সেনাপতি ও ছয়জন দেহরক্ষী অশ্বারোহী। গোরস্তানের কাছে এসে সুলতান আইয়ুবী অশ্ব থামালেন এবং অশ্বপৃষ্ঠ থেকে লাফিয়ে নেমে ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে তার সাথে মুছাফেহা করলেন।

'মুহতারাম সুলতান!' ইমাম সাহেব সুলতান আইয়ুবীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এ কথা সত্য যে, এখানে আপনার বিরুদ্ধে যারা লড়াই করেছে তারা সবাই মুসলমান ছিল। কিন্তু আমি তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনার যোগ্য মনে করি না। এদেরকে শহীদদের সাথে দাফন করা উচিত হয়নি আপনার। আমাদের মুজাহিদরা সত্যের জন্য যুদ্ধ করেছে, তাদেরকে

আপনি খুনীদের সাথে দাফন করলেন?'

'আমি তাদেরকেও শহীদ মনে করি, যারা বাতিলের পক্ষে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেছে।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'এরা তাদের সরকারের ধোঁকায় পড়ে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে। আমি আমার সৈন্যদেরকে আল্লাহর পথে লড়াই করার আহবান জানিয়েছিলাম। আমাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছে তাদের সরকার সৈন্যদেরকে মিথ্যা শুনিয়ে বিভ্রান্ত করেছে। আমাকে ইসলামের দুশমন হিসাবে চিত্রিত করে পেশ করেছে তাদের সামনে। বলেছে, আমি সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য লড়াই করছি। তারা তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকারী ইমামদের ব্যবহার করেছে। তারা আমার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছে। সেই মিথ্যা নসিহত শুনে এই সরলপ্রাণ সৈন্যরা প্রতারিত হয়েছে। সরকারী ইমামরা পুরস্কার ও অর্থের লোভে সৈন্যদেরকে বিভ্রান্ত করেছে বলেই তারা আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে সত্যের সৈনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আমি তাদের লাশের অপমান করতে পারি না। সে লাশগুলোকে একই গর্তে ফেলে গণকবর দিতে পরি না অথবা কোথায়ও জঙ্গল বা নদীতে ফেলে এসব লাশের আমি অবমাননা করতে পারি না। এদের মধ্যে যারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে তারা আমাদের সঙ্গে মিশে গেছে। কিন্তু যারা মারা গেছে তাদের কাছে সত্যের আলো পৌছাবার সুযোগ হয়নি আমাদের। তাদের সরকার তাদের চোখে যে পট্টি বেঁধে অন্ধ করে রেখেছিল সে পট্টি আমরা খুলে দিতে পারিনি। এ ব্যর্থতা আমাদের। তাই আমি তাদের জন্যও আল্লাহর কাছে ক্ষমা

চাই। হয়তো বেঁচে থাকার সুযোগ পেলে তারা একদিন সত্যের কাফেলারই সৈনিক হয়ে যেতো।'

'কিন্তু সুলতান!' ইমাম সাহেব আবেগঘন কণ্ঠে বললেন, 'তারা তো আপনার শত্রু হয়ে গিয়েছিল! তারা কেন্দ্রীয় খেলাফাতের অধীন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। নূরুদ্দিন জঙ্গীর ছেলে আল মালেকুস সালেহ, মুশেলের আমীর সাইফুদ্দিন ও হারানের কেল্লাধিপতি গুমাস্তগীন– এরা সবাই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে ঐক্যজোট করেছিল। শুধু তাই নয়, সামরিক জোট গঠন করে যুক্ত কমাণ্ডের অধীনে তারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এই যুদ্ধে ইসলামের দুশমন খৃস্টানরা তাদের পুর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। খৃস্টানদের এই সাহায্য-সহযোগিতার উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানরা যেন নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে দুর্বল ও ধ্বংস হয়ে যায়। যাতে মুসলমানরা খৃস্টানদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে অথবা এমন দুর্বল হয়ে থাকে যাতে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করতে না পারে। এত কিছুর পরও আপনি তাদের ক্ষমার যোগ্য মনে করেন?'

'এ জন্য দায়ী ক্ষমতালোভী শাসকরা, সাধারণ সৈনিকরা নয়। খৃস্টানরা মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তিগত ক্ষমতার লোভ সৃষ্টি করেছে, আর্থিক সাহায্য দিয়েছে, যুদ্ধের উপকরণ সরবরাহ করেছে, মদ ও সুন্দরী নারী দিয়ে মুসলমান আমীরদের অন্ধ করে রেখেছে। তাদের এ ষড়যন্ত্রের কারণেই নূরুদ্দীন জঙ্গীর ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে এরা ইসলামের অগ্রযাত্রার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো। আমি মিশর থেকে এ সংকল্প নিয়েই বের

হয়েছিলাম, এ ষড়যন্ত্রের আমি মূলোৎপাটন করবো। খৃষ্টানদের কবল থেকে আমাদের প্রথম কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাস ইসলামী হুকুমাতে শামিল করবো। আলহামদুলিল্লাহ, সে পথেই আমরা অগ্রসর হচ্ছি। কিন্তু পরিপূর্ণ বিজয় ছিনিয়ে আনতে হলে আমাদের এ কাফেলায় আরো মুজাহিদ শামিল করতে হবে। সেই মুজাহিদ আমি কোথায় পাবো? বিভিন্ন মুসলিম শাসকদের হাতে যে সৈন্যবল আছে তারাই হবে আমাদের সৈনিক। তাদেরকে যদি আপনি কোনভাবে একবার শুধু এটুকু বুঝাতে পারেন যে, ইসলামের জন্য আজ তাদের রক্ত দরকার, তাহলে দেখবেন, তারা দলে দলে এ জেহাদে শামিল হয়ে যাবে। এদের অপরাধ ক্ষমার চোখে না দেখলে কি করে তারা দ্বীনের মুজাহিদদের কাফেলায় শামিল হবে?'

ইমাম সাহেব মাথা নিচু করলেন। এই মহান মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধায় তার মাথা নত হয়ে এলো। তিনি ধরা গলায় বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করুন। বিষয়টি আমি কখনো এভাবে ভেবে দেখিনি।'

'না, এতে আপনার লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। আপনার চিন্তা ভুল, এ কথা আমি বলছি না। বাহ্যত আপনার কথাই ঠিক। কিন্তু একজন মুজাহিদের জন্য চর্মচক্ষুই যথেষ্ট নয়, তার চাই গভীর অন্তর্দৃষ্টি। যে দৃষ্টি দিয়ে সে দেখবে অতীতের ঘটনাবলী, দেখবে ভবিষ্যতের সমাজ ও রাষ্ট্র। আপনি জানেন, আজ কয়েক বছর ধরে হিম্মত থেকে হলব পর্যন্ত এই শস্য-শ্যামল প্রান্তরে মুসলমানের রক্ত বয়ে চলেছে অবিরাম ধারায়।

শেষ পর্যন্ত বিজয় সত্যেরই হলো। খৃস্টানদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে যারা পা দিয়েছিল, সেখান থেকে সরে আসতে বাধ্য হলো তারা। বিদ্রোহী সব কজন মুসলমান শাসকই আমাদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু এতে আমার মনে সামান্যতম আনন্দ বা উৎফুল্লতা সৃষ্টি হয়নি। কারণ ভ্রাতৃঘাতি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এ জাতির সামরিক শক্তির উল্লেখযোগ্য অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। আপনারা হয়তো ভাবছেন, এ লড়াইয়ে আমরা জিতেছি। কিন্তু আমার হিসাব মতে এ লড়াইয়ে খৃস্টানদের কূটনৈতিক তৎপরতারই বিজয় হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে খৃস্টানদের কূটনৈতিক চাল, কারণ তারা আমাদেরকে দিয়ে আমাদের ভাইদের হত্যা করাতে সমর্থ হয়েছে। অবস্থা এখন এতটাই নাজুক যে, নতুন করে সৈন্য সংগ্রহ না করে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হওয়ার কোন উপায় নেই আমাদের। তাই আপনি দোয়া করুন, আল্লাহ যেন বিপথগামী সৈনিকদেরকে হকের পথে আসার সুযোগ সৃষ্টি করে দেন।'

সুলতান আইয়ুবী এজাজ দুর্গের কাছে বিস্তৃত এক গোরস্তানের পাশে দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেবের সাথে কথা বলছিলেন। সে সময় তাঁর চেহারায় খেলা করছিল মালিন্য ও দুশ্চিন্তার ছাপ। তিনি ইমাম সাহেবকে আরো বললেন, 'আপনি প্রতি নামাজের 'পর এই দোয়াই করুন, আল্লাহ গাফুরুর রাহীম যেন এদের ক্ষমা করে দেন, যাঁরা বিভ্রান্তির কারণে বিপথগামী হয়েছিল। আর যারা জেনে বুঝে চোখে অন্ধত্বের পট্টি বেঁধে ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের জন্য বদ

দোয়া না করে তাদের বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিন।'

সুলতান আইয়ুবী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করলেন। কবরস্থানের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'আল্লাহ, এত রক্তের হিসাব কে দেবে? অন্তর্যামী, তুমি সাক্ষী, আমার ব্যক্তিগত লাভের জন্য আমি এক ফোটা রক্তও বইতে দেইনি।'

তিনি তাঁর সেনাপতিদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'চলো।'

ইমাম সাহেব দ্রুত তাঁর ঘোড়ার সামনে এসে বললেন, 'আপনার কাফেলায় শরীক হয়ে কোরবান হোক আমাদের সন্তানগুলো। আপনি কি যাওয়ার আগে আমাকে আরো কিছু নসিহত করে যাবেন?'

'আমাদের জাতি এখনও আত্মহত্যার পথে এগিয়ে চলেছে। কাফেররা রাসূলের উম্মতের শক্তি, সাহস ও আবেগ দেখে ভীত ও সন্ত্রস্ত। তারা এই শক্তিকে দুর্বল করার জন্য ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়ে দূরে বসে তামাশা দেখছে। বিচিত্র লোভের ফাঁদ পেতে তারা আমাদের ভাইদের মাথা ও বিবেক কিনে নিচ্ছে। না বুঝেই অনেকে তাদের কৌশলের জালে ধরা দিচ্ছে। পরিণতিতে ইতিহাস প্রত্যক্ষ করছে নিস্ফল গৃহযুদ্ধের অনাকাঙ্খিত অধ্যায়। আমরা যদি এখানেই এর গতিরোধ না করতে পারি, তবে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে দুঃসহ ভবিষ্যত। এই গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়া আর আত্মহত্যার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উম্মতে মোহাম্মদীর ধ্বংস ও অধপতনের জন্য এই গৃহযুদ্ধই যথেষ্ট। কাফেররা বর্তমান যুগের মত ভবিষ্যতেও মুসলিম জাতি থেকে গাদ্দারদের খুঁজে নেবে। তাদেরকে অর্থ ও যুদ্ধ উপকরণ সাহায্য দিয়ে এ জাতির

ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করতে সচেষ্ট থাকবে। আজকের মতই মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়ে তারা দূরে বসে তামাশা দেখবে। গুটি কয়েক লোক গদি ও ক্ষমতা লাভের জন্য উন্মাদের মত কাড়াকাড়ি করবে। সাধারণ মানুষকে তারা বানাবে বলির পাঠা। তাদের ঘাড়ে পা দিয়ে বসবে গিয়ে সিংহাসনে। জাতির সৎ ও কর্মঠ লোকগুলো অকেজো হয়ে যাবে। তাদের মাথার ওপর দিয়ে ছড়ি ঘুরাবে দুষ্টের দল। ইমামরা হালুয়া-রুটির ভাগ পেয়ে অসৎ শাসকের সপক্ষে সাফাই গাইবে। যখন এ অবস্থা হবে তখন এ জাতির ডুবতে আর বাকি থাকবে না। ক্ষমতা লাভের নেশায় কুচক্রীরা জাতির রক্ত এমন ভাবে বইয়ে দেবে যে, মানুষের মৃত্যুর হিসাব রাখাও সম্ভব হবে না। গ্রামের পর গ্রাম গোরস্তানে পরিণত হবে। যদি পারেন এই বিষয়গুলো আপনার মুসল্লি ও সন্তানদের বুঝাতে চেষ্টা করুন। তাদের ঈমানকে সতেজ ও সজীব করে গড়ে তুলুন। তাদেরকে কোরানের সে কথা ভাল করে বুঝিয়ে দিন, যেখানে বলা হয়েছে, যে জাতি তার নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করে না আল্লাহও তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেন না। আল্লাহর ওপর গভীর আস্থা, ঐক্য, সংহতি ও দৃঢ় ঈমানই জাতি হিসাবে তাদেরকে পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়ে রাখবে।'

সুলতান তাঁর কথা শেষ করে চলতে শুরু করলেন। তাঁর সঙ্গের সেনাপতিরাও ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে চলতে লাগলেন সুলতানের সাথে।

'গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা এখন শেষ হয়ে গেছে, সুলতান।' একজন

সেনাপতি সুলতানের পাশাপাশি তার ঘোড়া নিয়ে বললো, 'এখন সামনের চিন্তা করুন। আমাদের বায়তুল মুকাদ্দাস ডাকছে। আমাদের প্রথম কেবলা অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের জন্য।'

'কিন্তু ওদিকে যে মিশরও আমায় ডাকছে।' সুলতান আইয়ুবী চলতে চলতেই বললেন, 'ওদিক থেকে খুব আশংকাজনক সংবাদ আসছে। সেখানে আমার দায়িত্ব পালন করছে আমার ছোট ভাই। সে আমাকে দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচানোর জন্য কঠিন অবস্থার সংবাদ গোপন করছে। আলী বিন সুফিয়ান এবং পুলিশ সুপার গিয়াস বিলকিসও আমাকে বিস্তারিত কিছু জানাচ্ছে না। শুধু এইটুকু সংবাদ পেয়েছি, শত্রুদের গোপন তৎপরতা এখন বাড়াবাড়ি রকমের বেড়ে গেছে। মনে হচ্ছে, শেখ মান্নানকে আছিয়াত থেকে বিতাড়িত করাটা ভুল হয়েছে। উচিত ছিল তাকে এবং তার দলকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া। তাহলে তার খুনী দলটা আজ মিশরে অপতৎপরতা চালাতে পারতো না। সম্প্রতি আমাদের দু'জন কমাণ্ডার অত্যন্ত গোপনে আততায়ীর হাতে নিহত হয়। তাদের শরীরে কোন ক্ষতচিহ্ন বা আঘাতের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মরার পর লাশের ময়না তদন্তে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, তাদের বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়েছে। আমার অনুমান, এদেরকে বিশেষ এক ধরনের হিরোইন জাতীয় নেশার দ্রব্য প্রয়োগ করে খুন করা হয়েছে। এ ধরনের নেশার দ্রব্য কেবল ফেদাইন খুনীচক্রই ব্যবহার করে।'

'আপনি কি তবে শিঘ্রই মিশর যেতে চান?' চিন্তান্বিত কণ্ঠে

বললো সেই সেনাপতি, 'সৈন্যদেরকে কি এখানেই রেখে যাবেন, না সঙ্গে নিয়ে যাবেন?'

'এ সম্পর্কে আমি এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেইনি।' সুলতান সালাহউদ্দিন বললেন, 'হয়তো কিছু রক্ষী সঙ্গে নিতে পারি। সৈন্যের প্রয়োজন এখানেই বেশী। খৃস্টান শত্রুরা মিশরে ধ্বংসাত্মক কাজ এ জন্য বাড়িয়ে দিয়েছে, যাতে আমি ফিলিস্তিনের দিকে অগ্রসর না হয়ে মিশরে ফিরে যাই। আমি তাদের এ উদ্দেশ্য পুরণ হতে দিতে পারি না। কিন্তু মিশরের সমস্যাও আমি এড়িয়ে যেতে পারবো না। আমাকে অবশ্যই মিশর যেতে হবে, তবে আমি ফিলিস্তিনের দিকে আমার অগ্রযাত্রাও অব্যাহত রাখবো।

০

সুলতান আইয়ুবীর সন্দেহ ভিত্তিহীন ছিল না। খৃস্টানদের বুদ্ধি ও কৌশল তাঁর চেয়ে কেউ বেশী বোঝেন না। যখন তিনি করবস্থানে ফাতেহা পাঠ করে তাঁর সামরিক হেড কোয়ার্টারে যাচ্ছিলেন, তখন শেখ মান্নান ত্রিপলী পৌঁছে গিয়েছিল। হাসান বিন সাবাহের পর এই দলের মুরশিদ রূপে আবির্ভূত হয় শেখ মান্নান। এই ব্যক্তিই এখন ফেদাইন খুনীচক্রের দলনেতা।

সুলতান আইয়ুবী খৃস্টান ও তাদের পদলেহী মুসলিম গাদ্দারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালালে ফাঁক তালে সে তার দলকে আরো মজবুত ও সক্রিয় করে তোলে। কারণ আইয়ুবী ও খৃস্টান পক্ষ মুখোমুখি হওয়ায় তার দিকে নজর দেয়ার মত

সময় কারো ছিল না। এই সময় এ ভাড়াটে খুনীর দল শেখ মান্নানের নেতৃত্বে সুসংহত ও তৎপর হয়ে উঠে। তারা খৃস্টান ও তার সহযোগীদের কাছ থেকে পয়সা পেয়ে সুলতান আইয়ুবীর উপর বহু বার আক্রমণ চালিয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই তাঁকে হত্যা করার পরিবর্তে নিজেরাই খুন হয়ে গেছে। যারা খুনের হাত থেকে বাঁচতে পেরেছে, তারা হয়েছে বন্দী।

খৃস্টানরা শেখ মান্নানকে আছিয়াত দুর্গটি উপহার দিয়েছিল আইয়ুবীকে হত্যা করার শর্তে। দুর্গটি ১১৭৬ সালের মে মাসে সুলতান আইয়ুবী দখল করে নেন। শেখ মান্নানকে দলবলসহ নিরস্ত্র অবস্থায় কেল্লা থেকে বেরিয়ে যাওয়ারও সুযোগ দিলে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যায় তারা। এই ক্ষমাই যেন আইয়ুবীর জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল, অন্তত এখন আইয়ুবীর তাই মনে হচ্ছে।

শেখ মান্নান ১১৭৬ সালের জুন মাসে ত্রিপলী গিয়ে উপস্থিত হয়। তার সাথে তার বাহিনী এবং সাঙ্গ-পাঙ্গরাও ছিল। ত্রিপলী (বর্তমান লেবানন) ও তার আশপাশের বিস্তৃত এলাকা খৃস্টান রাজা রিমাণ্ডের অধিকারে ছিল। শেখ মান্নান তার কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইল।

শেখ মান্নানকে পেয়ে খুশী হল রিমাণ্ড। সে অনতিবিলম্বে অন্যান্য খৃস্টান সম্রাট ও ক্রুসেড নেতাদের ত্রিপলী ডেকে পাঠালো। উদ্দেশ্য, সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে একটি সমন্বিত ও অপ্রতিরোধ্য যুদ্ধের কর্মসূচী গ্রহণ করা।

খৃস্টান গোয়েন্দা সংস্থার অভিজ্ঞ পরিচালক জার্মান বংশোদ্ভূত হরমনও সেই সভায় উপস্থিত হল। সবাই আসন গ্রহণ করার

পর শেখ মান্নান বলতে শুরু করল, 'আপনারা আমাকে এই বলে অভিযুক্ত করতে পারেন যে, আমি সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছে পরাজিত হয়ে এখানে এসেছি। আপনারা জানেন, আমরা সৈন্যদের মত সম্মুখ লড়াইয়ে পারদর্শী নই। সুলতান আইয়ুবীর মোকাবেলা করতে গিয়ে যেখানে আপনাদের বিশাল বাহিনী ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে আমরা মুষ্টিমেয় ফেদাইন কেমন করে সাফল্যের আশা করতে পারি! আমার তো মনে হয়, আপনারা আপনাদের মুসলমান বন্ধুদের সৈন্য সাহায্য দান করলেও সুলতান আইয়ুবীর মোকাবেলায় তারা সফল হতে পারবে না।'

'শেখ মান্নান!' গর্জে উঠল রাজা রিমাণ্ড, 'এ বিষয়টি আমাদের মধ্যেই আলোচনা করতে দাও। আমরা সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো সেটা আমাদের ব্যাপার। আমরা কি পারি না পারি, সে পর্যালোচনা করতে আমরা তোমাকে ডেকে পাঠাইনি। আমরা তোমাকে বলতে চাই, তুমি সুলতানকে হত্যা করার কথা বলে বার বার আমাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়েছ। কিন্তু প্রতিবারই তোমার লোক ব্যর্থতা বরণ করেছে। শেষ বার যে চারজনকে পাঠিয়েছিলে, তারাও ব্যর্থ হয়েছে। আইয়ুবীকে খুন করার পরিবর্তে নিজেরাই খুন হয়ে গেছে তারা। সুলতান আইয়ুবীর ওপর তোমার একটি অভিযানও সফল হয়নি। এতে কি প্রমাণ হয় না, তুমি অযোগ্য ব্যক্তিদের পাঠিয়েছিলে? তারা মারা যাক অথবা গ্রেফতার হোক, তাতে তোমার কিছু যায় আসে না? আমরা তোমাকে যে মূল্য দিয়েছি সেগুলো সবই বৃথা গেছে?'

'শুধু এক সালাহউদ্দিনকে হত্যা করা যায়নি বলে আপনাদের সব অর্থ বৃথা গেছে, এই যদি হয় আপনার বক্তব্য, তাহলে আমি বলবো, আপনি ঠিক বলেননি।' শেখ মান্নান বললো, 'আমি মিশরে সুলতান আইয়ুবীর যে দু'জন চৌকস সেনা অফিসারকে হত্যা করিয়েছি, তার মূল্যটা হিসাবে ধরবেন না? আপনার তিন শক্তিশালী শত্রু সুদানে ছিল, তাদেরকে আমি কবরে নামিয়েছি। এর ফলে সেখানে আপনার প্রবেশের রাস্তা বাঁধা মুক্ত হয়েছে, এর মূল্যটা কি আপনি ধরবেন না? আপনার ইঙ্গিতে আমি মিশরে গুপ্তহত্যা শুরু করে দিয়েছি। আপনি কি সে কাজকেও ব্যর্থ বলবেন?'

'আইয়ুবী কবে নিহত হবে?' ফ্রান্সের ক্রুসেড নেতা গে অব লুজিনান টেবিলে থাবা মেরে বললো, 'তুমি নূরুদ্দিন জঙ্গীকে বিষ দিয়েছিলে, তেমন করে কবে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে বিষ দিয়ে হত্যা করতে পারবে?'

'সে কথা এখন আমি কেমন করে বলবো? এখন তো বাতাস সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর অনুকূলে বইছে। আপনাদের সহায়তায় যে সব মুসলমান তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল, তারাই এখন সুলতান আইয়ুবীর সমর্থক ও অনুগত হয়ে গেছে। হলবের আল মালেকুস সালেহ ও তার সহযোগী সাইফুদ্দিন আইয়ুবীর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। তার বিরোধী গুমাস্তগীন খুন হয়েছে। এ অবস্থায় তাকে হত্যা করা সহজ হবে না। তবে আমি আপনাদের কথা দিতে পারি, যেদিন সেই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হবে, তাকে আমি অবশ্যই খুন করবো।'

'সেই ধরনের অবস্থা বলতে তুমি কি বুঝাতে চাচ্ছো? আইয়ুবী কি স্বেচ্ছায় তোমার তলোয়ারের নিচে এসে মাথা পেতে দেবে?'

'না, তা দেবেন কেন? তবে যেমন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল নূরুদ্দিন জঙ্গীর সময়, তেমন সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে ঘায়েল করা সম্ভব নয়।' শেখ মান্নান বললো, 'নূরুদ্দিন জঙ্গী ভুমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় এমন বেকারার হয়ে দৌড়ঝাঁপ করতেন, অন্য কোন দিকেই তার খেয়াল ছিল না। তাঁর নাওয়া-খাওয়ার কোন সময় ছিল না। কে তার রান্না করছে, কে খাওয়াচ্ছে, এসব দিকে নজর দেয়ার সময়ও ছিল না তার। এই সুযোগটাই গ্রহণ করেছিল আমার খুনীরা। তারা এমন বিষ খাদ্যের মধ্যে মিশ্রিত করে দিয়েছিল, যাতে তাঁর গলার ভেতর ক্ষত হয়ে যায় এবং গলা ফুলে যায়। সেই খাবার গ্রহণের পর তিনি শয্যাশায়ী হতে বাধ্য হন। চিকিৎসকরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার রোগের কারণ খুঁজে বের করতে পারেনি। তিনি তিন-চারদিন বিছানায় শুয়ে ছটফট করে কাটান। পঞ্চম দিন অত্যধিক গলা ফোলার কারণে তাঁর নি:শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং তিনি মারা যান। তাঁর ব্যক্তিগত হাকীম মৃত্যুর পর যে ডাক্তারী রিপোর্ট লেখেন তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'নূরুদ্দিন জঙ্গী 'গলা ফোলা' রোগে মারা গেছেন।' কিন্তু সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর অবস্থা ভিন্ন। তার বিশ্বস্ত ও নির্ধারিত বাবুর্চি ছাড়া অন্য কেউ তার খাদ্য দ্রব্যের কাছেও যেতে পারে না।'

'তুমি কি সে বাবুর্চিকে কিনতে পারো না?' এক কমাণ্ডার প্রশ্ন

করল।

'এ প্রশ্নের উত্তর আমার চেয়ে আমাদের বন্ধু হরমন ভাল দিতে পারবেন।' শেখ মান্নান হরমনের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

*

হরমন। গোয়েন্দা জগতের এক অমূল্য প্রতিভা। ব্যক্তিগতভাবে তিনি জার্মানীর নাগরিক হলেও সমগ্র খৃস্ট জগতে রয়েছে তার অবাধ যাতায়াত। আলী বিন সুফিয়ানের মতই গোয়েন্দাগিরীতে লোকটি অসামান্য দক্ষ। তার চোখের অনুসন্ধানী দৃষ্টি মানুষের বুকের হাড় অতিক্রম করে ভেতরে ঢুকে যায়। চরিত্র হনন ও ধ্বংসাত্মক কাজে তিনি সমান পারদর্শী।

অতীতে মিশরে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যে কয়টি ষড়যন্ত্র কিছুটা কার্যকর হয়েছিল তার পরিকল্পনা তিনিই করেছিলেন। সুলতান আইয়ুবীর কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারকে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। অথচ তারা আইয়ুবীর খুবই বিশ্বস্ত ছিল। তিনি মুসলমান আমীর ও অফিসারদের মনস্তাত্বিক দিক ভাল বুঝতেন। তাকে কাজে লাগানোর কৌশলও ভাল জানতেন তিনি। খৃস্টান রাজা ফিলিপ অগাস্টাস তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। লোকটির মেধা ও যোগ্যতা এমন ইর্ষণীয় ছিল যে, তিনি সুদান, মিশর ও আরবের সব এলাকার স্থানীয় ভাষা হুবহু সেই ভাবেই উচ্চারণ করতে পারতেন। ফলে যে অঞ্চলে তিনি যেতেন, লোকেরা তাকে সে অঞ্চলেরই একজন মনে করতো।

'শেখ মান্নান ঠিকই বলেছে।' হরমন বললো, 'এর উত্তর

আমারই দেয়া উচিত। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বাবুর্চিকে কেন কেনা যায় না তা আমার চাইতে কেউ বেশী জানে না। ব্যাপারটি যদি শুধু সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর হতো, তবে তিনি বিষ পান করে কবেই মারা যেতেন। কারণ তিনি তাঁর নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে কখনো চিন্তা করেন না। তাঁর খাবার কেউ পরীক্ষা করলো কি না, এ খবর তিনি কোনদিনই নেননি। তিনি তার জীবন ও প্রাণ আল্লাহর হেফাজতে ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, আল্লাহ তাঁর মৃত্যু যে দিন লিখে রেখেছেন সে দিনই হবে।

তাঁর দেহরক্ষী দলের কমাণ্ডার, ইন্টেলিজেন্সের এক দায়িত্বশীল অফিসার এবং আলী বিন সুফিয়ানের নিয়োজিত আরো এক ব্যক্তি তার খাবার পরীক্ষা করে ভাল ভাবে দেখেশুনে তবে তাঁর সামনে পরিবেশন করে। কখনও কখনও সুলতানের ব্যক্তিগত ডাক্তারও এসে তাঁর খাবার চেক করে যায়।

এতসব কড়া তত্ত্বাবধান ছাড়া আরও একটি অসুবিধা হলো, তাঁর বাবুর্চি ও চাকর-বাকররা সবাই তার মুরীদ! তাদের অন্তরে তাঁর জন্য রয়েছে অন্ধ ভক্তি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা-ভালবাসা। কারণ আইয়ুবী তাদেরকে চাকর মনে করে না। তাদের সাথে ভাই অথবা বন্ধুর মত ব্যবহার করে। আমরা বিষয়টি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর এই বিশ্বস্ত দলের মধ্য থেকে কাউকে কেনা যেমন কঠিন, তার মধ্যে অন্য কাউকে ঢোকানোও কঠিন। তার চারপাশে যে সব ব্যক্তিবর্গ আছে, তারা তার

চারপাশে নিশ্ছিদ্র প্রাচীর খাঁড়া করে রেখেছে। বিশেষ করে আলী বিন সুফিয়ান, গিয়াস বিলকিস, হাসান বিন আব্দুল্লাহ ও জাহেদানের চোখ এড়িয়ে তার কাছে পৌঁছা কিছুতেই সম্ভব নয়। ওরা সবাই বিচক্ষণ ও অনুসন্ধানী দৃষ্টির অধিকারী। ওরা মানুষের চোখের ভাষা যেমন পড়তে পারে, তেমনি মানুষের অন্তরের গোপন গহীনে লুকিয়ে রাখা ইচ্ছা এবং স্বপ্নগুলোও পড়ে ফেলতে পারে। তাই কোন খুনী আইয়ুবীর কাছে পৌঁছতে পারে না।'

'ইসলামের সমাপ্তি!' ফিলিপ অগাস্টাস বললো, 'আমি শতবার বলেছি যে, আমাদের কাজ হলো, ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করা! এ এমন এক ধর্ম, যা মানুষকে বশীভূত করে ফেলে। এ ধর্ম মানুষের দেহকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করে তেমনি তার আত্মাকেও নিয়ন্ত্রণ করে। যে ব্যক্তি ইসলামকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে, দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে পরাজিত করতে পারে না। আপনারা দেখেছেন, সুলতান আইয়ুবীর পাশে যে সব মুসলমান আছে, তারা কট্টর ধর্ম বিশ্বাসী। ধর্মের প্রতি তাদের এমনি অটল বিশ্বাস যে, অর্থ-সম্পদ, হীরা-জহরত ও সেরা সুন্দরী দিয়েও ধর্মের সাথে তাদের আত্মার বন্ধন ছিন্ন করা যায় না। তোমরা যাদের খরিদ করতে পারো, তারা দুর্বল ঈমানের মুসলমান। তারা ইসলামকে অন্তরে গভীরভাবে গ্রহণ করেনি বলেই তোমরা তাদের পাকড়াও করতে পারছো। তোমরা দেখেছো, আমাদের বিশাল বাহিনীকে সুলতান আইয়ুবীর অল্প সংখ্যক সৈন্য কেমন করে পরাস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। যেখানে আমাদের সৈন্য ও অশ্বগুলো পিপাসায় ক্লান্ত হয়ে যায়

সেখানে সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা পিপাসা ও ক্লান্তি থেকে থাকে একেবারে নির্বিকার। এই ধৈর্যকেই তারা বলে ঈমান। আমাদের প্রথম কাজ হলো তাদের এই ঈমানকে দুর্বল করা। হরমন তাদের দু'চার জন উচ্চ অফিসার ও আমীরকে কৌশলে মুঠোর মধ্যে নিয়েছে, এটা অবশ্যই প্রশংসার কাজ! এর দ্বারা আমরা অনেক উপকার পাবো। কিন্তু এখন এমন পথ অবলম্বন করতে হবে, যাতে এ জাতির মন থেকে ধর্মের নেশা কেটে যায়। যাতে ধর্মের বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষ ওদের মনেই দানা বেঁধে ওঠে। বয়স্কদের কাছে ইসলামের বিরুদ্ধে বলে তাদের মন পরিবর্তন করা সহজ ব্যাপার নয়। তাই তাদের বংশধর ও নতুন প্রজন্মের সামনে বিভ্রান্তির জাল বিস্তার করতে হবে। তাদেরকে তোমাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করো। তাদের কাঁচা মনে যে কোন মতবাদ কার্যকরী হবে। তাদের মধ্যে পশু প্রবৃত্তি ও ধ্বংসাত্মক কাজের প্রেরণা দান করো।'

'ইহুদীরা এ কাজে বেশী পারদর্শী।' হরমন বললো, 'তারাই এখন রণাঙ্গণে এ দায়িত্ব পালন করছে। আমিও চেষ্টা করছি। আমাদের প্রচেষ্টার ফল ক্রমশ ফলতে শুরু করেছে। একদিনে বা কয়েকদিনে আপনি কোন মতবাদ ও বিশ্বাস পরিবর্তন করতে পারবেন না। এমন কাজে অনেক সময়ের প্রয়োজন, এর পিছনে যুগ যুগ কেটে যায়।'

'এ কাজ চালিয়ে যেতে হবে।' ফিলিপ অগাস্টাস বললেন, 'আমরা এ আশা করবো না যে, পরিণাম ফল আমাদের জীবনেই সফল হয়ে যাবে। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, যদি আমরা

চরিত্র হননের এই কাজে তৎপর থাকি, সেদিন বেশী দূরে নয়, মুসলমান শুধু নামকাওয়াস্তে মুসলমান থাকবে। তাদের সামনে ধর্মীয় দায়িত্ব শুধু সামাজিক নিয়ম ও প্রথা হিসেবেই থেকে যাবে। তাদের উপরে ধীরে ধীরে খৃস্টানী চাল-চলন চালু হয়ে যাবে। তাদের চিন্তাধারায় খৃস্টান জগত প্রাধান্য পাবে।

'শেখ মান্নান!' রাজা রিমাণ্ড বললেন, 'যদি তুমি আছিয়াত দুর্গের পরিবর্তে অন্য কোন দুর্গ চাও, তবে আমরা এক্ষুণি সে দাবী পুরণ করতে পারবো না। আমাদের চুক্তি ঠিকই থাকবে। কেল্লার শর্ত ছাড়া অন্যান্য শর্ত বহাল থাকবে। তুমি যথা নিয়মে তোমার প্রাপ্য পেতে থাকবে। যদি তুমি আর্থিক অনুদান ও সাহায্য ঠিক মত পেতে চাও, তবে কায়রোসহ সমস্ত মিশরে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সেনাবাহিনী ও সরকারী গুরুত্বপূর্ণ লোকদের হত্যা করার কর্মসূচী অব্যাহত রাখবে। আর সেই সাথে সুযোগ মত সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করার চেষ্টাও জারী রাখবে।'

'সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করার বিষয়ে আমি স্পষ্ট বলতে চাই, আমি তাঁর পিছনে আর কোন লোক ক্ষয় করতে চাই না।' শেখ মান্নান বললো, 'তাকে হত্যা করা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। তার পিছনে লেলিয়ে দিয়ে আমি আমার সবচেয়ে দামী ও দক্ষ ফেদাইনদের শেষ করেছি। আমার বলতে দ্বিধা নেই, সুলতান আইয়ুবী আমাকে নতুন জীবন দান করেছে। আমি যখন তার সামনে অস্ত্র সমর্পণ করলাম, তখন ভেবেছিলাম, আমি তার ওপর যে হত্যা প্রচেষ্টা চালিয়েছি তাতে তিনি আমাকে তো হত্যা করবেনই সেই সাথে নেতৃস্থানীয় সকল

ফেদাইনকে নির্মূল করবেন। কিন্তু তিনি আমাকে ও আমার সঙ্গীদের সকলকেই ক্ষমা করলেন। তিনি নিজ মুখে ক্ষমা ঘোষণা করার পরও আমি তা বিশ্বাস করতে পারিনি। ভেবেছিলাম, তিনি আমাদের সাথে তামাশা করছেন। তিনি যে আমাদের ধোঁকা দিচ্ছেন না এ কথা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, আমরা যখনই যাওয়ার জন্য ফিরে দাঁড়াবো সঙ্গে সঙ্গে তার তীরন্দাজরা আমাদের পিঠে তীর বিদ্ধ করে হত্যা করবে বা আমাদের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে। কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি এবং আমার সঙ্গী-সাথীরা সবাই বহাল তবিয়তে আপনাদের সামনে এসে উপস্থিত হতে পেরেছি। আপনারা আমাকে সাহায্য দেয়া বন্ধ করলেও আমি আর সুলতান আইয়ুবীকে হত্যার কোন চেষ্টা করবো না। কিন্তু কায়রোতে আমার ফেদাইন কর্মীরা আপনাদের নিরাশ করবে না। কায়রোতে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হবে, সুলতান আইয়ুবী তার অগ্রাভিযান বন্ধ রেখে কায়রো ফিরে আসতে বাধ্য হবে।'

হরমন বলল, 'হ্যাঁ, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমিও ভেবে রেখেছি, খুব শীঘ্রই সুদানীদের দিয়ে মিশরের সীমান্ত চৌকিতে আবার আক্রমণ চালাবো। তবে এ মুহূর্তে মিশরের ওপর কোন বড় রকমের আক্রমণ চালানোর প্রয়োজন নেই। আক্রমণের এমন পায়তারা করতে হবে, যাতে সুলতান আইয়ুবী সিরিয়া থেকে মিশরে ফিরতে বাধ্য হন।'

হরমন ছিল গোয়েন্দাগিরী ও কূটচালে বিশেষ দক্ষ ব্যক্তি।

কিন্তু সেও জানতো না, এই কনফারেন্সে এমন ব্যক্তি উপস্থিত আছে, যার মাধ্যমে সুলতান আইয়ুবী তাদের সকল তৎপরতার খবর পেয়ে যাবে। লোকটি এখানকার পানশালার এক কর্মচারী। অফিসারদের মদ ও আহারের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত। নাম ভিক্টর। ফ্রান্সের নাগরিক। সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা হিসাবে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছে।

তার এক সঙ্গী আছে রাশেদ চেঙ্গিস। তুর্কী মুসলমান। সে নিজেকে গ্রীকের এক খৃস্টান নাগরিক পরিচয় দিয়ে এখানে চাকরীতে ঢুকেছে। এই রাশেদও সুলতান আইয়ুবীর এক গোয়েন্দা।

এদেরকে অনেক যাচাই বাছাই করার পর এখানে ডিউটি দিয়েছে খৃস্টানরা। কারণ এখানকার কনফারেন্সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ লোকের সমাগম ঘটে। অনেক প্রথিতযশা ব্যক্তিরা আসেন এখানে। আসেন বিভিন্ন দেশের রাজা ও সম্রাটগণ, আসেন সমরবিদ ও সেনাপতিরা, কূটনৈতিক মিশনের উচ্চপদস্থ অফিসার, প্রশাসনের বড় বড় দায়িত্বশীলগণ।

এদের মিটিংয়ে উপস্থিত থেকে আহার ও পানীয় সরবরাহ করার জন্য যাদের নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের মধ্যে ভিক্টর এবং রাশেদও ছিল।

আমরা জানি, সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দারা সর্বত্র জালের মত ছড়িয়ে আছে। খৃস্টানদের ভেতরের তথ্য ও সংবাদ জানার জন্য সেখানেও ঢুকে পড়েছিল আইয়ুবীর গোয়েন্দারা। তাদেরই দুইজন ভিক্টর ও রাশেদ। শেখ মান্নানের সাথে খৃস্টান

সম্রাটদের কি কি কথা হল, সবই শুনে নিল এই দুই গোয়েন্দা। এর বিস্তারিত রিপোর্ট দু'একদিনের মধ্যেই সুলতান আইয়ুবীর কাছে পৌঁছে যাবে।

০

কায়রোতে তখন ধ্বংসাত্মক তৎপরতা পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। একদিন মিশরীয় বাহিনীর এক কমাণ্ডারের লাশ পাওয়া গেল শহরের বাইরে। সন্ধ্যার পরে সে বাড়ীর বাইরে গিয়েছিল ব্যক্তিগত কাজে। সারা রাত বাড়ীতে না ফেরায় বাড়ীর লোকজন চিন্তিত হল। সকাল বেলা তার লাশ পাওয়া গেল শহরের বাইরে। তার শরীরে কোন ক্ষতচিহ্ন ছিল না। সামান্য আঘাতের চিহ্নও পাওয়া যায়নি কোথাও। লাশের ময়না তদন্ত হল। তদন্তকারী দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করল। তারা সেখানে শুধু তার পায়ের চিহ্নই দেখতে পেল। কমাণ্ডারের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া হল। সবাই তার চরিত্র ও চাল-চলন সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করল। নিন্দার পরিবর্তে সকলেই তার প্রশংসা করল। কোন সন্দেহভাজন লোকের সাথে তার মেলামেশা ছিল বলে জানা গেল না। তার স্ত্রীর জবানবন্দী নেয়া হল। স্ত্রী তাকে সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলে উল্লেখ করল। সে আরো জানাল, কমাণ্ডার খুবই কর্তব্যপরায়ণ ও হাসি খুশী দীলখোলা প্রকৃতির লোক ছিল।

এটা যে একটা খুন এ ব্যাপারে তদন্তকারী দলের কোন সন্দেহ

ছিল না, কিন্তু শত অনুসন্ধান করেও খুনীর কোন সন্ধান পেল না তারা। এমনকি অনুসন্ধানের জন্য কোন প্রমাণ বা সূত্রও তারা উদ্ধার করতে পারল না।

তিন চার দিন পরের ঘটনা। সে যে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল তার মৃত্যুর পর অন্য এক কমাণ্ডারের ওপর সে দায়িত্ব অর্পন করা হয়। দায়িত্ব পাওয়ার তিন দিনের মাথায় একই পরিণতি ঘটে তার। সারাদিন ডিউটি শেষে রাতে সে তার কামরায় ঘুমিয়েছিল। সকালে ঘুম থেকে না উঠায় সঙ্গীরা তাকে ডাকাডাকি করল, কিন্তু ঘুম ভাঙল না তার। শেষে কামরার দরজা ভেঙে দেখা গেল সেই সেনা কমাণ্ডার তার নিজের কামরায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

সেনা ব্যারাকে সে একা এক কামরায় থাকতো। তার সম্পর্কেও খোঁজখবর নেয়া হল। সকলেই তার সম্পর্কে খুব ভাল রিপোর্ট দিল। তার বন্ধু মহল শোকাতুর কণ্ঠে জানাল, তার সাথে কারো কোন বিবাদ বা মনোমালিন্য ছিল না। হত্যার স্পষ্ট কোন কারণ ছিল না। বাহ্যত এটাকে খুন বলার কোন অবকাশ নেই। কারণ তারও শরীরে কোন আঘাত বা ক্ষতচিহ্ন ছিল না। এমনকি সামান্য আঁচড়ের দাগও নেই শরীরের কোথাও।

সরকারী ডাক্তার লাশ দেখলেন। লাশের ঠোঁটের কোণে সামান্য একটু শুকনো ফেনা মত ছিল। তিনি সেই ফেনা কাঠি দিয়ে উঠিয়ে একটি পাত্রে রাখলেন। তারপর তিনি একটি কুকুর আনালেন। ফেনাটুকু এক টুকরো মাংসের সাথে লাগিয়ে মাংসের টুকরাটি কুকুরকে খেতে দিলেন।

তিনি কুকুরটি তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। ঘরে বসে লক্ষ্য রাখা যায় এমন একটি জায়গায় কুকুরটি বেঁধে রেখে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। কুকুরটা কোন রকম অস্বাভাবিক আচরণ করল না। অযথা ছুটাছুটি বা চিৎকারও করলো না। তাকে যে খাবার দেয়া হলো সেগুলো সে স্বাভাবিক ভাবেই খেয়ে নিল। ডাক্তার সারা রাত জেগে থেকে কুকুরটির প্রতি লক্ষ্য রাখলো। মাঝ রাতের পর কুকুরটি দড়ি টানতে শুরু করল। যত সময় যেতে লাগল ততই তার ছুটাছুটি বাড়তে লাগল। অনেক্ষণ ছুটাছুটির পর কুকুরটি ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে তার দৌড়াদৌড়ি বন্ধ হয়ে গেল এবং দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে কুকুরটা হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ডাক্তার বাইরে এলেন। কুকুরটির কাছে গিয়ে দেখলেন, কুকুরটি মারা গেছে। ডাক্তার রিপোর্ট দিলেন, কমাণ্ডার দু'জনকে এমন বিষ প্রয়োগ করে মারা হয়েছে, যে বিষ প্রয়োগ করার সাথে সাথেই আক্রান্ত ব্যক্তি তা টের পায় না। একটা বিশেষ সময় পরে সে বিষের ক্রিয়া শুরু হয় এবং আক্রান্ত ব্যক্তি কিছু বুঝে উঠার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বিষ রোগীর কেবলমাত্র হার্টে আঘাত করে এবং ওখানেই জমাটবদ্ধ হয়ে থাকে। ফলে সারা শরীরের আর কোথাও তার প্রভাব পড়ে না। এ জন্যই কমাণ্ডার দু'জনের রক্ত ও গোশত পরীক্ষা করে আমরা কোন বিষের সন্ধান পাইনি।

ডাক্তারের রিপোর্ট পাওয়ার পর গোয়েন্দা বিভাগ ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল। এই অভিনব পদ্ধতিতে এর আগে আর কোন

খুনের ঘটনা এখানে ঘটেনি। তাদের মনে হলো, যুদ্ধের একটি নতুন সেক্টর খুলে বসেছে দুশমন। তারা ব্যাপারটা আলী বিন সুফিয়ানকে জানাল।

আলী বিন সুফিয়ানও বিষয়টি জানতে পেরে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করবেন বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি। কিন্তু শত্রুকে এখনি পাকড়াও করতে না পারলে ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। একজন দু'জন নয়, হাজার হাজার সৈন্য সহজেই শিকার হতে পারে এ বিষের। কেবল সৈন্যরা নয়, প্রশাসনের উচ্চপদস্থ অফিসার, আমীর-ওমরা, সেনাপতি, এদের যে কেউ যে কোন সময় আক্রান্ত হতে পারে।

আলী বিন সুফিয়ান এই খুনী চক্রের হোতাদের খুঁজে বের করার জন্য কঠিন সংকল্প গ্রহণ করলেন। মরার আগে এই কমাণ্ডাররা কার কার সাথে সাক্ষাৎ করেছে, কোথায় গিয়েছে, কার সাথে খানা খেয়েছে, এসব খোঁজখবর নেয়া শুরু করলেন তিনি। কিন্তু এর থেকে সন্দেহভাজন এমন কাউকে খুঁজে পেলেন না, যার পিছনে লেগে এ ষড়যন্ত্রের সুরাহা করা যেতে পারে।

কমাণ্ডারের স্ত্রীকে ডেকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, কিন্তু তার কাছ থেকেও কোন তথ্যই এমন পাওয়া গেল না, যাকে অবলম্বন করে সামনে অগ্রসর হওয়া যায়।

কমাণ্ডার দু'জনই খাঁটি মুসলমান ছিল, নিষ্ঠাবান মুজাহিদ ছিল। যুদ্ধের ময়দানে এ দুই কমাণ্ডারের বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখে স্বয়ং সুলতান আইয়ুবীও তাদের প্রশংসা করেছেন। এরা

দু'জনই সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কমাণ্ডার হিসাবে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেছে। তাদের সময় কোন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বর্ডার অতিক্রম করতে পারেনি। সুদানী অনুপ্রবেশকারীরা বহু বার তাদের হাতে ধরা পড়েছে। সুদানীরা মোটা অংকের ঘুষ দিতে চেয়েও কখনোই তা দিতে পারেনি এবং গ্রেফতারও এড়াতে পারেনি। লোভ এবং ভয় দু'টোই তারা জয় করে নিয়েছিল। তাদের তৎপরতায় খুশী হয়ে সরকার তাদের পদোন্নতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। শীঘ্রই এ দুই কমাণ্ডারকে সহ-সেনাপতি পদে পদোন্নতি দেয়ার ঘোষণা জানানো হতো। কিন্তু আফসোস, ঘোষণা শোনার আগেই দুশমনের মরণ বিষ কেড়ে নিল তাদের জীবন।

ঘটনার আকস্মিকতায় আলী বিন সুফিয়ান গোয়েন্দা বাহিনীর কমাণ্ডারদের সম্মেলন ডাকতে বাধ্য হলেন। তিনি ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে সমবেত কমাণ্ডারদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমি নিশ্চিত, এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড দু'টি ক্রুসেড দুষ্কৃতকারীরা ঘটিয়েছে, আর তাদের হয়ে এ কাজ আঞ্জাম দিয়েছে খুনী ফেদাইন চক্র।' তিনি আরো বললেন, 'শত্রুরা এখন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হত্যার কাজ শুরু করে দিয়েছে। তাই সেনাবাহিনীর সমস্ত কমাণ্ডার ও অফিসারদের সতর্ক থাকতে হবে। কোন অজানা লোক ও সন্দেহভাজন ব্যক্তির দেয়া কোন কিছু খাওয়া যাবে না। বরং এমন অচেনা ও সন্দেহজনক লোককে চোখে চোখে রাখতে হবে। প্রয়োজনে তাদের গ্রেফতার করতে হবে।'

দ্বিতীয় কমাণ্ডার হত্যার আট দিন পরের ঘটনা। এক রাতে সৈন্যরা ক্যাম্পে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েছিল। ক্যাম্প প্রহরীরা যথারীতি পাহারা দিচ্ছিল ক্যাম্প, হঠাৎ ক্যাম্পে আগুন লেগে গেল। আগুনটা লাগল ক্যাম্পের গুদাম ঘরে। এক জায়গায় হাজার হাজার তাঁবু স্তুপ করে রাখা ছিল। স্তুপের ওপর ছিল তাবুর ছাউনি। সেখানে রোজকার মত সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছিল, তবুও সেখানে কেমন করে যেন আগুন লেগে গেল।

এই অগ্নি সংযোগের ব্যাপারটা আলী বিন সুফিয়ানকে নতুনভাবে ভাবিয়ে তুলল। এটা যে শত্রুদের নাশকতামূলক কাজেরই একটা অংশ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এখানে হঠাৎ করে আগুন লাগার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এর আশেপাশে রান্নাবান্না বা অন্য কোন কারণে কখনো আগুন জ্বালানোর প্রয়োজন পড়ে না।

একদিকে অচেনা বিষের ছোবল, অন্যদিকে খোদ সেনা ছাউনীতে আগুন দেয়ার বিষয়টি যেমন আলী বিন সুফিয়ানকে চিন্তাগ্রস্ত করে তুলল, তেমনি আরো একটি সমস্যা পেরেশান করে তুলল আলী বিন সুফিয়ানকে। ইদানিং সীমান্ত ফাঁড়িগুলো থেকে যে সংবাদ আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে, সুদানের বর্ডার দিয়ে চোরের মত গোপনে বর্ডার পার হওয়ার প্রবণতা খুব বেড়ে গেছে। সীমান্ত ফাঁড়িগুলোকে এ ব্যাপারে সাবধান ও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। অবশ্য সীমান্ত প্রহরীরা যথেষ্ট সজাগ ও সতর্ক। তাই ইদানিং গ্রেফতারের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। সুদানীদের এই অনুপ্রবেশের পিছনে নিশ্চয়ই কোন কুমতলব কাজ করছে। সব মিলিয়ে অবস্থা

বেশ নাজুক ও জটিল হয়ে গেছে। এ অবস্থায় কি করা যায় ভেবে কোন কূলকিনারা পাচ্ছিলেন না আলী বিন সুফিয়ান। বিষয়টি তিনি গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে জানানোর তীব্র তাগিদ অনুভব করলেন।

আলী বিন সুফিয়ান তার গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতা আরও বাড়িয়ে দিলেন। আগের চেয়ে বেশী সাবধানতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিলেন গোয়েন্দা কর্মীদের।

o

কায়রো থেকে দূরে নীলনদের পাশে এক পাহাড়ী এলাকা। সেই বিরান পাহাড়ী অঞ্চলে ফেরাউন যুগের কিছু ধ্বংসাবশেষ ছিল। ক্রুসেডার ও সুদানীরা এই ধ্বংসাবশেষের ভেতর গোপন আড্ডা বানিয়ে এখান থেকে তাদের অভিযান পরিচালনা করতো।

কেবল সে পাহাড়ী অঞ্চল নয়, মিশরে এমন পুরাতন ধ্বংসাবশেষ অনেক অঞ্চলেই ছিল। এই সব পাহাড়ী এলাকায় কড়া দৃষ্টি রাখার জন্য আলী বিন সুফিয়ান তার গোয়েন্দাদের মধ্য থেকে একদল কমাণ্ডোকে বাছাই করলেন। তাদেরকে বিশেষ কিছু নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন সে সব অঞ্চলে। দুর্গম পাহাড়ী এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে পড়লো আলীর পাঠানো গোয়েন্দা বাহিনী। কিন্তু এক মাসের মধ্যেই সেসব এলাকা থেকে আলীর কাছে ফিরে এলো দুঃসংবাদ।

এই এক মাসের মধ্যেই আলী বিন সুফিয়ানের পাঁচ জন

গোয়েন্দা ময়দান থেকে একদম হাওয়া হয়ে গেল। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার, কোন একটি বিশেষ এলাকা থেকে নয়, কায়রোর আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এরা নিখোঁজ হয়েছে। আলীর কাছে আরো খবর এল, এরা কেউ বিশ্রামের সময় নয়; বরং গায়েব হয়েছে ডিউটিরত অবস্থায়।

এরা এমন গোয়েন্দা ছিল, যারা ক্রুসেড গোয়েন্দাদের গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে অতীতে পারদর্শীতা দেখিয়েছে। কিন্তু আজ তারা নিজেরাই নিখোঁজ হয়ে গেছে। হয়তো গ্রেফতার হয়েছে নতুবা মারা গেছে। যাই ঘটুক, আলীর জন্য কোনটাই শুভ সংবাদ নয়। মৃত্যুর চেয়ে গ্রেফতার হওয়াটাই বরং বেশী ভয়ের। কারণ, তারা ধরা পড়লে ক্রুসেড বাহিনী তাদের কাছ থেকে তথ্য আদায় করবে। এরপর তাদেরকে হাশিশ প্রয়োগ করে নেশাগ্রস্ত করবে। তারপর নেশার ঘোরের মধ্যে ফেলে তাদের সম্মোহন করবে। সম্মোহিত এইসব সৈন্যরা তখন মিশরের সেনাবাহিনী ও সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে অবলীলায়। কারণ তারা যে শত্রুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, এই বোধ তখন আর তাদের মধ্যে কাজ করবে না। বরং যে তাদের কমাণ্ড করবে তাকেই তারা তাদের কমাণ্ডার মনে করবে।

বিপদ এখানেই শেষ নয়। আলী বিন সুফিয়ানের সামনে আসল বিপদ হয়ে দেখা দিল অন্য বিষয়। শত্রুর গোয়েন্দারা যে আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দাদের চিনে ফেলেছে, এটিকেই তিনি সবচে বড় বিপদ বলে গণ্য করলেন।

গোয়েন্দাগিরীর ক্ষেত্রে নিজেকে আড়াল করাই হলো

গোয়েন্দাদের প্রথম ও প্রধান কাজ। এ জন্য যে কোন ধরনের ছদ্মবেশ ধারণে তাদেরকে পারঙ্গম হতে হয়। যে গোয়েন্দা নিজের পরিচয় গোপন করতে পারে না, তার পক্ষে গোয়েন্দা কাজ করা মোটেও সম্ভব নয়।

গোয়েন্দা জগতে আলী বিন সুফিয়ানের একটি সুনাম ছিল। তাঁর কাছে ট্রেনিং পাওয়া গোয়েন্দাদের একটা মর্যাদা ছিল সর্ব মহলে। কিন্তু সে মর্যাদা ও সম্মান আজ যেন ধুলায় মিশে গেল। এক জন নয়, দু'জন নয়, এক মাসে পাঁচজন গোয়েন্দা ধরা পড়ে গেল দুশমনের হাতে! তাহলে এতদিন তিনি তাদের কি শিখিয়েছেন! তাঁর বাছাই করা গোয়েন্দারাই যদি দুশমনকে পাকড়াও করার পরিবর্তে নিজেরা ধরাশায়ী হয়ে পড়ে তাহলে সাধারণ গোয়েন্দাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে? এসব প্রশ্ন এসে আলী বিন সুফিয়ানকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল।

সারা রাত আলী বিন সুফিয়ানের কোন ঘুম হলো না। তিনি রাতভর জেগে কাটালেন এবং চিন্তা করলেন। ফজরের আজান হলো। তিনি সৈনিকদের সাথে একত্রে জামায়াতে নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষে তিনি একজন কাসেদকে ডাকলেন। কাসেদ হাজির হলে তাকে বললেন, 'আমি একজন লোককে এই মুহূর্তে আমার কাছে পেতে চাই। তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে আমার সাথে দেখা করার জন্য খবর দাও।' তারপর তিনি লোকটির নাম ও ঠিকানা দিয়ে কাসেদকে বিদায় করে দিলেন।

আলী বিন সুফিয়ান একজন যোগ্য গোয়েন্দাকে খুঁজছিলেন, যার ওপর তিনি এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করবেন। এ সময়

তার মানসপটে ভেসে উঠল একটি নাম- মেহেদী আল হাসান। মেহেদী আল হাসান জেরুজালেম ও ত্রিপলীতে খুব সফলতার সাথে গোয়েন্দাগিরী করে এসেছে। এ যুবক খুবই বীর ও সাহসী। সবচে বড় কথা, সে অসম্ভব রকম দূরদর্শী। এখনকার মিশন সফল করতে হলে এরকম দূরদর্শী লোকেরই প্রয়োজন।

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো মেহেদী আল হাসান। আলী বিন সুফিয়ান তাকে কাছে পেয়েই বললেন, 'যুবক, তোমাকে একটি জটিল দায়িত্ব দিতে চাই। আশা করি তুমি সানন্দে তা গ্রহণ করবে।'

'আপনি আমাকে কোন দায়িত্ব দেয়ার যোগ্য মনে করেছেন, এতেই আমি খুশী। আপনি যে কোন কঠিন দায়িত্ব আমাকে দিতে পারেন। জাতির স্বার্থে ইসলামের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে আমি সর্বদা প্রস্তুত।'

আলী বিন সুফিয়ান তাকে অভিযানের গুরুত্ব বুঝিয়ে বললেন। এ পর্যন্ত যা ঘটেছে সব তাকে খুলে বলে বললেন, 'সেই পাহাড়ী এলাকায়ই শুধু আমাদের দুই গোয়েন্দা নিখোঁজ হয়েছে। তাই আমার মনে হচ্ছে, সেখানে ওদের শক্ত ঘাঁটি রয়েছে। প্রথমে আমি তোমাকে সে এলাকায়ই পাঠাতে চাই।'

মেহেদী আল হাসান সানন্দে এ দায়িত্ব কবুল করে বিদায় নিল আলী বিন সুফিয়ানের কাছ থেকে।

সেই দুর্গম এলাকায় যাতায়াতের মাত্র একটিই রাস্তা। রাস্তাটি চলে গেছে নীল নদের পাশ ঘেঁষে। রাস্তার অপর পাশে পাহাড়ী তৃণভূমি। মাঝে মাঝে উপত্যকা ও ময়দান। ছোট বড় নানা

আকারের পাহাড়ের চূড়া মাইলের পর মাইল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরের দিকে সবুজ ঘাস এবং গাছপালাও আছে। কোথাও কোথাও পানির ঝিলও আছে, যার চারপাশে পাড়ের মত খাঁড়া বা আধ-খাঁড়া পাহাড়।

মেহেদী আল হাসান সে অঞ্চলে পা দিয়েই টের পেল, এলাকায় সন্দেহজনক লোকের যাতায়াত আছে।

নীল নদের পাড় ধরে এগিয়ে চলল মেহেদী আল হাসান। কোথাও রাস্তা নীল নদের একদম পাশ ঘেঁষে এগিয়েছে, কোথাও জঙ্গল বা পাহাড়ের বেশ ভেতরে ঢুকে পড়েছে। ঘোড়ায় চড়ে স্বাভাবিক গতিতে এগুচ্ছে সে। কোথাও ফেরাউনের কোন মহলের ধ্বংসাবশেষ এখনো তার নজরে পড়েনি। ফেরাউনের মহলের ধ্বংসাবশেষ এখানে আদৌ আছে কিনা তাই সন্দেহ। অন্তত রাস্তা থেকে কেউ কোনদিন ফেরাউনের ধ্বংসাবশেষ দেখেছে বলে জানা যায়নি। কিন্তু এ বিশ্বাস সবারই ছিল, পাহাড়ের মধ্যে ফেরাউন কিছু না কিছু বানিয়ে রেখেছে যা এখনও অক্ষত আছে। তবে সে অঞ্চলে পৌঁছতে হলে রাস্তা ছেড়ে তাকে দুর্গম অঞ্চলের গভীরে ঢুকতে হবে। সে অঞ্চল এমন নির্জন যে, দুষ্কৃতকারীদের গোপন আড্ডা হওয়ার উপযুক্ত জায়গাই বটে।

মেহেদী আল হাসান সে অঞ্চলের বেশ গভীর পর্যন্ত ঢুকে আবার ফিরে এল। পরদিন দু'টো উট, কিছু মেষ ও বকরি নিয়ে জংলী রাখাল সেজে সেখানে গেল। পাহাড়ী অঞ্চলের বেশ গভীরে ঢুকে পশুগুলোকে ছেড়ে দিল। পশুগুলো আপন মনে চরে বেড়িয়ে ঘাস খেতে লাগল। আর সে মরু

বেদুইনদের মত পাহাড়ী এলাকায় সজাগ দৃষ্টি রেখে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ঘুরতে ঘুরতে সে এই বিজন পাহাড়ী অঞ্চলের আরো গভীরে ঢুকে যেতে লাগল। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই তার দৃষ্টিতে পড়ল না। আরও অগ্রসর হয়ে সম্মুখে একটি পাহাড় দেখতে পেল। সমতল ক্ষেত্র থেকে বিশ-পঁচিশ ফুট উপরে সে পাহাড়ে একটা প্রাকৃতিক সুড়ংয়ের মুখ হা করে আছে। মেহেদী আল হাসান সেই সুড়ংয়ের মুখে এসে দাঁড়াল।

বিশাল সুড়ং। সুড়ংটা এতই প্রশস্ত যে, তার মধ্য দিয়ে উট চালিয়ে নেয়া যাবে। পাহাড়ের ভেতরে কতদূর চলে গেছে এ সুড়ং বুঝার উপায় নেই। কারণ ভেতরটা অন্ধকার। মেহেদী আল হাসান পাহাড়ের চুড়া টপকে অপর দিকে গেল। সেখানে সে দেখতে পেল সংকীর্ণ মাঠ। কিন্তু কোন মানুষের ছায়াও নেই সেখানে।

হতাশ হল মেহেদী আল হাসান। দুশমনের আড্ডা খুঁজে বের করার জন্য সে এই পাহাড়ের রাজ্যে এসেছে। কিন্তু কোথায় দুশমন? কোথায় তাদের আস্তানা বা আড্ডা? সে আবার এসে দাঁড়াল সুড়ংয়ের মুখে। আস্তে করে পা রাখল সুড়ংয়ে। সুড়ংটা খুব দীর্ঘ। অন্ধকার প্রথম দিকে বেশী জমাট নয়, হালকা হালকা ফিকে ভাব। ডান ও বায়ের দেয়ালে অনেক গহ্বর। সেখানে বড় বড় পাথর বসানো। এত বড় পাথর যে, একটা মানুষ অনায়াসে সেখানে লুকিয়ে বসে থাকতে পারবে।

মেহেদী আল হাসান সেই সুড়ং ধরে অনেক দূর এগোলো। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পেল না। এভাবে কয়েকদিন

ঘুরে ফিরে কিছুই না পেয়ে মেহেদী আল হাসান মিশরের গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ানকে রিপোর্ট দিল, 'যত দূর দৃষ্টি যায় ঘুরে ফিরে দেখেছি। সন্দেহজনক কিছুই আমার চোখে পড়েনি। একটা বিশাল সুড়ং পেয়েছি। কিন্তু এত দিনেও সে সুড়ং পথে কোন লোককে ভেতরে যেতে আসতে দেখা যায়নি।'

আলী বিন সুফিয়ান বললো, 'তুমি সারাদিন কোন গোপন জায়গায় বসে সুড়ংয়ের মুখে নজর রাখো। ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করো না। তাতে ধরা পড়া ও মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

আলী বিন সুফিয়ান তাকে আরো বললো, 'মাঝে মাঝে উটের উপর চড়ে রাতেও সেখানে গিয়ে খোঁজ নিও। যদি কোন লোকের দেখা পাও এবং তাদের হাতে ধরা পড়ে যাও, বলবে, আমি কায়রো যাচ্ছি। নিজেকে কৃষক হিসাবে পরিচয় দিও।'

এই নির্দেশ অনুযায়ী মেহেদী আল হাসান রাতেও সেখানে ডিউটি দিতে লাগল। এক রাতে সেখানে কারো পদধ্বনি শুনতে পেল। এই পদধ্বনি কোন জংলী পশুর না মানুষের তা নিশ্চিত হতে পারল না মেহেদী আল হাসান। সে পদধ্বনির পিছনে তাড়া না করে কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলো, পরে সে রাতের মত ফিরে এলো নিজের আস্তানায়।

পরের দিন। সূর্য উদয়ের আগেই দু'টি উট, কিছু মেষ ও ছাগল নিয়ে সেখানে চলে গেল মেহেদী আল হাসান। পশুর পাল মুক্ত মাঠে ছেড়ে দিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো সে। এক জায়গায় পৌঁছে দেখতে পেল লম্বা লম্বা ঘাস, ঝোপঝাড় ও তৃণলতা জড়াজড়ি করে আছে সেখানে। তার মাঝে জংলী ফুলের চারায় ফুটে আছে অজস্র ফুল। সেই ফুলের দিকে ঝুঁকে আছে একটি লোক। লোকটির পরণে দামী কাপড়। মুখে লম্বা দাড়ি, মাথায় দামী পাগড়িও আছে।

মেহেদী আল হাসান লোকটির দিকে এগিয়ে গেল। তার পায়ের আওয়াজ পেয়েই সম্ভবত দাড়িওয়ালা লোকটি তার দিকে মুখ তুলে তাকালো। মেহেদী আল হাসানের সাথে চোখাচোখি হল সে লোকের। ধীরে ধীরে হেঁটে ওই দামী পোষাক পরা লোকটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে।

জোব্বা পরা লোকটির হাতে একটা থলে ছিল। থলের মধ্যে লতাপাতা রাখা। তার অন্য হাতে একটি জংলী চারার ডাল।

'আপনি কি খুঁজে বেড়াচ্ছেন?' মেহেদী আল হাসান বোকার মত হেসে বললো, 'কোন জিনিস হারিয়ে গেলে বলুন, আমিও খুঁজে দেখি?'

'আমি কবিরাজ!' লোকটি বললো, 'জরি, বুটি খুঁজে বেড়াচ্ছি। এগুলো দিয়ে ঔষুধ বানানো হবে।'

মেহেদী আল হাসান এবার লোকটির মুখের দিকে ভাল করে তাকাল। তাকিয়েই সে তাকে চিনতে পারলো। তিনি

কায়রোর প্রসিদ্ধ হেকিম। চিকিৎসক হিসাবে তার যথেষ্ট খ্যাতি ও নাম-ডাক আছে।

মেহেদী আল হাসান সরল মনেই বিশ্বাস করল লোকটির উত্তর। সত্যি তো, একজন হেকিম হিসাবে তিনি জরি বুটি অনুসন্ধান করতেই পারেন। আর জরি বুটি সংগ্রহের উত্তম স্থানও এটাই।

হেকিম তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি এখানে কি করছো?'

'এখান থেকে একটু দূরেই থাকি আমরা। এখানে পশুর পাল নিয়ে এসেছি চরাতে ও পানি পান করাতে।' আগন্তুকের প্রশ্নের জবাব দিয়ে মেহেদী আল হাসান আবার প্রশ্ন করল, 'এই জরি বুটি দিয়ে আপনি কি রোগের ঔষুধ বানাবেন?'

'তুমি সে রোগের নাম জান না, আর বললেও বুঝবে না।' হেকিম উত্তর দিল, 'কিছু কিছু রোগ এমন আছে, রুগী নিজেও টের পায় না তার কি হলো। শুধু এক ধরনের অস্বস্তি ও অশান্তি অনুভব করে। অথচ সে এমন মারাত্মক অসুখে ভুগছে যে, সময় মত ঔষধ না পড়লে একটু পর লোকটি মারা যাবে।'

এ হেকিম খুবই নামকরা ডাক্তার ছিল। দূর-দূরান্ত থেকে তার কাছে রুগীরা আসতো। মেহেদী আল হাসান তাকে এখানে পেয়ে গেছে, এটা তার সৌভাগ্য।

মানুষের একটা সহজাত দুর্বলতা এই যে, হাতের কাছে ডাক্তার পেলেই তার মনে নানা রকম অসুখের কথা উদয় হয়। ডাক্তার কাছে পেলে সে তার অসুখের কথা বলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

মেহেদী আল হাসানেরও কিছু শারিরীক অসুবিধা ছিল। সে সেই অসুবিধার কথা হেকিমকে জানালো। হেকিম তার হাতের পাল্‌স পরীক্ষা করলো। পরে তার চোখের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে চমকে উঠলো, যেন তার চোখ কোন আশ্চর্য জিনিস দেখতে পেয়েছে। হেকিম মেহেদী আল হাসানের হাত ছেড়ে দিয়ে তাকে আপাদমস্তক ভাল করে নজর বুলিয়ে দেখলো। হেকিমের চেহারায় আশ্চর্যের ভাব দেখে মেহেদী আল হাসানও কিছুটা অবাক হলো। সে প্রশ্ন করলো, 'কি ব্যাপার! আপনি এমন অবাক হয়ে কি দেখছেন?'

'তুমি আমার দাওয়াখানায় আসবে?' হাকিম তাঁর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো।

'আমি খুব গরীব মানুষ!' মেহেদী আল হাসান বললো, 'আপনাকে টাকা দেব কোথেকে।'

'টাকার কথা পরে ভেবো। সে নিয়ে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। তুমি বরং এক্ষুণি আমার সাথে চলো।'

'কি বলছেন আপনি!' মেহেদী আল হাসান অবাক হয়ে বললো, 'আমার উট চরছে, মেষ ও ছাগল চরছে। এগুলো ফেলে আমি কোথায় যাবো?'

'তোমার উট, ছাগল তুমি নিয়ে চলো। ওগুলো সামলে রেখেই আমার সাথে শহরে যাবে। তোমার কাছ থেকে আমি কোন টাকা নেব না। আমাকে ধনী লোকেরা অনেক টাকা পয়সা দিয়ে যায়। গরীবদের চিকিৎসা আমি বিনা পয়সায় করে থাকি। তোমার অসুখ তো এখন সাধারণ পর্যায়ে আছে, হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে। তোমার রোগ নিয়ে আমার অন্য

রকম সন্দেহ আছে।'

মেহেদী আল হাসান তখন ডিউটিতে ছিল। এই সামান্য অসুখের জন্য ডিউটি ত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে হেকিমকে বললো, 'আমার অসুখ কি খুব খারাপ? ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন, সন্ধ্যার পর আমি আপনার দাওয়াখানায় পৌঁছে যাবো। আপনি দয়া করে আপনার ঠিকানা ও রাস্তা বলে দিয়ে যান, কোথায় যেতে হবে।'

যদিও মেহেদী আল হাসান হেকিম সাহেবের ঠিকানা ভাল করেই জানতো, তবু সে এমন একটা ভাব করলো, যেন সে ওই ঠিকানা সম্পর্কে কিছুই জানে না। হেকিম সাহেব তাকে ঠিকানা ও সেখানে পৌঁছার রাস্তা ভাল করে বুঝিয়ে বললেন।

মেহেদী আল হাসান বললো, 'সন্ধ্যার পর পরই আমি আপনার ঠিকানায় পৌঁছে যাবো ইনশাআল্লাহ।'

০

মেহেদী আল হাসান সন্ধ্যার পর ঠিক সেই রাখালের পোষাকেই হেকিমের দাওয়াখানায় গিয়ে পৌঁছলো। সে তার উট সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল, যাতে হেকিমের মনে কোন রকম সন্দেহ না জাগে। সে জানতো, হেকিমরা ঔষুধের গাছ-গাছড়া খুঁজে বেড়ায় এবং তাদের ঔষধে রোগ-ব্যাধি ভালও হয়। তার যেটাকে সাধারণ রোগ বলে মনে হচ্ছে সেটা কোন ভয়াবহ রোগও হতে পারে। হেকিম সাহেব যখন এটাকে গুরুতর মনে করছেন তখন তাকে হালকাভাবে দেখা ঠিক

নয়।
সে হেকিম সাহেবকে সালাম দিলে হেকিম সাহেব খুব উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, 'তাহলে তুমি এসে পড়েছো? ঠিক আছে, বসো।'
হেকিম সাহেব তাকে খুব ভাল করে দেখলেন। তার নাড়ী পরীক্ষা করলেন, চোখ দেখলেন, জিহবা দেখলেন, বল্লেন, 'ঠিক আছে, আমি তোমাকে ঔষুধ দিয়ে দিচ্ছি। যদি এতে উপশম না হয় তবে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। তিন দিন পর তুমি আবার আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। যদি দেখি এ ঔষধে কাজ হয়নি, তখন বুঝবো, আমি যা সন্দেহ করেছি তাই ঠিক। তখন অন্য ঔষধ দিতে হবে।'
মেহেদী আল হাসান কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি সন্দেহ করছেন?'
'আল্লাহ না করুন, আমার সন্দেহটা যেন সত্য না হয়।' হেকিম সাহেব বললেন, 'তুমি একে তো খুব সুন্দর যুবক, তাতে ওই বিরাণ মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াও। যে স্থানে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, সে জায়গাটা ভাল নয়। সেখানে প্রেতাত্মারা বসবাস করে। এই প্রেতাত্মাদের মধ্যে ফেরাউন যুগের সেরা সুন্দরী মেয়েদের আত্মাও রয়েছে। তাদেরকে ফেরাউন জোরপূর্বক তার কাছে রেখেছিলেন আমোদ-স্ফূর্তির জন্য। শেষে তাদেরকে সেখানেই হত্যা করা হয়, যাতে তারা অন্য কারো হাতে না পড়ে। মানুষের আত্মা কখনো বৃদ্ধ হয় না, সব সময় যৌবন অবস্থায় থাকে। যেসব সুন্দরী মেয়েদের হত্যা করা হয়েছিল তাদের আত্মা এই সবুজ

বিয়াবানে বিভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায়।

আমার সন্দেহ হচ্ছে, ফেরাউন যুগের মেয়েদের খপ্পরে তুমি পড়ে গেলে কিনা। তোমার মত সুন্দর যুবককে দেখতে পেলে ওরা সহজেই তোমাকে ভালবেসে ফেলবে। তুমি একাকী সেই মরু বিয়াবানে চলাফেরা করো। সেই সুন্দরী মেয়েদের আত্মাগুলোর সাথে তোমার আত্মার যোগাযোগ হয়ে গেলে তুমি আর তাদের খপ্পর থেকে বেরোতে পারবে না।'

'ওরা আমার কোন ক্ষতি তো করবে না?' মেহেদী আল হাসান হেকিমের কথায় প্রভাবিত হয়ে বললো, 'প্রেতাত্মার ভালবাসা পাওয়া তো কোন ভাল কথা নয়! আপনি কি ঐ প্রেতাত্মার কবল থেকে আমাকে মুক্ত করতে পারবেন?'

'আমার ধারণা ভুলও হতে পারে, আগে ঔষুধপত্র দিয়ে দেখি।' হেকিম বললেন, 'যদি উপশম না হয়, তবে প্রেতাত্মার নজর দূর করতে অন্য ব্যবস্থা নেবো। আমার কাছে তারও চিকিৎসা আছে। দোয়া তাবিজ দেব, কিছু আমলও বাতলে দেবো। যদি প্রয়োজন পড়ে, তবে সে আত্মাকে এখানে হাজির করে তোমাকে ছেড়ে যেতে বলবো। প্রেতাত্মার কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যা যা করণীয় সব করবো আমি। ভয় নেই, প্রেতাত্মারা তোমার কোন ক্ষতি করবে না।'

মেহেদী আল হাসান ছিল হুশিয়ার গোয়েন্দা। কিন্তু সে আলেম ছিল না। জাতির প্রতিটি ব্যক্তির মত সেও জ্বীন, ভূত ও প্রেতাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। সে জ্বীন পরীদের নিয়ে যত গল্প কাহিনী শুনেছে, সেগুলোকে সত্য বলেই মনে হয়েছে তার। তাই সেগুলো সে বিশ্বাসও করেছে।

হেকিম সাহেবের প্রতিটি কথা ও শব্দ তার মনে দৃঢ় হয়ে বসে গেল। তার মনের ওপর প্রেতাত্মার ভয় আরও বেশী করে চেপে বসলো। সে হেকিমের কাছে গোয়েন্দাগিরী করতে নয়, বরং চিকিৎসার জন্যই গিয়েছিল। হেকিম তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল, 'ভয় নেই যুবক। প্রেতাত্মারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি কোন চিন্তা করো না। তেমন কিছু হলে আমি তারও চিকিৎসা করবো।'

কিন্তু হেকিম সাহেব যত আশ্বাসই দিক না কেন, তার দুশ্চিন্তা এতে আরো বেড়ে গেল। হেকিম তাকে ঔষুধের একটি মাত্র পুরিয়া দিয়েছিল, আর বলেছিল, 'রাতে শোয়ার আগে খেয়ে শুয়ে পড়বে।'

সে শোয়ার আগে ঔষধ খেয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম এসে গেল। এর আগে তার কোন দিন এত জলদি ঘুম আসেনি। সকালে যখন চোখ খুললো, তখন সে অনুভব করলো, তার শরীর অসম্ভব রকম দুর্বল।

সে সেই দুর্বল শরীর নিয়েই আলী বিন সুফিয়ানের কাছে গেল। কিন্তু তাঁকে হেকিমের পাহাড়ী এলাকা থেকে গাছ-গাছড়া বা জরি বুটি সংগ্রহের কথা কিছুই বলল না। তার কাছে এটা বলার মত কোন কথা নয়, কেননা হেকিম সাহেব কোন সন্দেহজনক ব্যক্তি নন। তিনি কায়রোর এক প্রসিদ্ধ হেকিম। সামরিক ও প্রশাসন বিভাগের বড় বড় অফিসাররা তার রোগী। তার সম্পর্কে এ কথাও প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি দোয়া-তাবিজ দিয়ে জ্বীন-পরী বশে রাখেন।

আলী বিন সুফিয়ান মেহেদী আল হাসানকে বললেন, 'তুমি

তোমার নির্ধারিত জায়গায় ডিউটি দেয়া অব্যাহত রাখো। একদিন না একদিন সন্দেহজনক লোক সেখানে তুমি দেখতে পাবেই।'

আলী বিন সুফিয়ান দুষ্কৃতকারীদের গোপন আড্ডার সন্ধানে তাকে আবার সেই দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে ডিউটিতে পাঠিয়ে দিলেন।

মেহেদী আল হাসান ডিউটিতে যাওয়ার আগে হেকিমের সাথে দেখা করল। সে তখনো রাখালের বেশেই ছিল। হেকিমকে সে বললো, 'এত সকালে অনেক দূর থেকে শুধু এ কথা বলার জন্য আমি ছুটে এসেছি যে, রাতে আমার গভীর ঘুম এসেছিল এবং এখন আমি এতই দুর্বল বোধ করছি যে, জীবনে কখনও এমন দুর্বল বোধ করিনি।'

'যদি সন্ধ্যা পর্যন্ত তুমি এমন অবস্থায়ই থাকো, তবে তোমার ওপর জ্বীন-পরীর কোন আত্মার আছর হয়নি মনে করবে।' হেকিম বললেন, 'সন্ধ্যায় তুমি আবার এসো। আমি তোমাকে দুর্বলতা দূর করার ঔষধ দিয়ে দেবো।'

মেহেদী আল হাসান উটের উপর আরোহণ করল এবং সোজা তার কর্তব্য স্থলে চলে গেল।

০

বেশ কিছু দিন হয়ে গেল সেই সবুজ প্রান্তরে নিয়মিত যাতায়াত করছে মেহেদী আল হাসান। সমস্ত দিন সে সেখানেই কাটিয়ে দেয়, কখনো রাতেও সেখানে যায়। আগে

রাতের বেলা এই বিজন প্রান্তরে ঘুরতে গিয়ে সে মোটেও ভয় পেতো না। কিন্তু হেকিমের কাছ থেকে জ্বীন-পরীর কাহিনী শোনার পর থেকে তার ইদানিং কেমন যেন একটু ভয় ভয় করছে। হেকিম যদিও তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে, প্রেতাত্মারা তার কোন ক্ষতি করবে না, তবু প্রেতাত্মার কথা মনে হলেই ভয়ের একটা শিহরণ পায়ের পাতা থেকে মাথায় লাফিয়ে ওঠে। সে যদিও ভীতু স্বভাবের লোক নয়, তবুও এই অদেখা রহস্যময় সৃষ্টি তার মনে কেমন যেন কাঁপন জাগায়। রাতে পথ চলতে গেলেই তার মনে হয়, তার আশেপাশে যেন প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদিকে ডিউটির তাগিদ অন্য দিকে হেকিমের আশ্বাসের কারণে সে নিজের মনকে প্রবোধ দিচ্ছিল, 'ভয়ের কিছু নেই। এখানে কোন জ্বীন-পরী নেই। আর থাকলেও হেকিম তো বলেই দিয়েছে, তারা আমার কোন ক্ষতি করবে না।'

এভাবে সে নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছিল আর সেই সাহসে ভর করে রাতেও পাহাড় প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে ডিউটি দিচ্ছিল।

এই ডিউটিরত অবস্থায় হঠাৎ তার মনে হলো, তার অবস্থা আগের চেয়ে বেশী শোচনীয়। তার মধ্যে হঠাৎ করেই অস্থিরতা দেখা দিল এবং তার মনে হতে লাগল, তার রোগটি যেন অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেছে।

তার অন্তরে হঠাৎ করেই ভয়ের কাঁপন শুরু হয়ে গেল এবং রাত যত বাড়তে লাগল ততই ভয়ও বেড়ে চললো তার। সে নিজেকে সামলে নেয়ার অনেক চেষ্টা করলো, কিন্তু তার মনে ভয় বেড়েই চললো। সে হেকিমকে তার যে কষ্টের কথা

বলেছিল সেই কষ্ট যেন আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেল।
তার ইচ্ছা করছিল সে ছুটে হেকিমের কাছে চলে যায়। কিন্তু তার দায়িত্ববোধ তাকে ডিউটি ফেলে কোথাও যেতে নিষেধ করলো। এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার সাধ্য তার ছিল না, তাই সে ওই স্থান ত্যাগ করতে পারল না। সে তার কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করেই ডিউটি অব্যাহত রাখল। অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে তার এই অবস্থা কেটে যেতে লাগল এবং এক সময় সে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে এল। তার মন আবার ভয়শূন্য হয়ে গেল, যেমন ঔষুধ খাওয়ার আগে ছিল, ঠিক সে অবস্থায় ফিরে এল মেহেদী আল হাসান। তার মনে হলো, এতক্ষণ সে একটি ঘোরের মধ্যে কাটিয়েছে। হয়তো এই ঘোর লাগাকেই বলে প্রেতাত্মার প্রভাব।
রাত শেষ হয়ে এল। সে ফিরে এল তার ডেরায়। সামান্য একটু ঘুমিয়ে নিয়ে সে ছুটলো হেকিমের কাছে। রাতে তার যে অবস্থা হয়েছিল সব তাকে খুলে বলল। হেকিম তাকে বলল, 'এতক্ষণে নিশ্চিত হওয়া গেল, সত্যি তোমার ওপর প্রেতাত্মারা ভর করেছে। তুমি এখন চলে যাও, সন্ধ্যায় এসে ঔষধ নিয়ে যেও।'
সে আবার উট, মেষ ও বকরীর পাল গুছিয়ে সেই প্রান্তরে গেল। সারাদিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে এল বাড়ীতে। তারপর এক উটের পিঠে সওয়ার হয়ে চলে এল শহরে, হেকিমের কাছে। হেকিম তাকে আরও একদিন ঔষধ খেতে বললেন। তিনি তাকে ঔষুধ দিয়ে বিদায় দিলেন। মেহেদী আল হাসান রাতে শোয়ার আগে ঔষধটুকু খেয়ে নিল। গত

রাতের মত তার শীঘ্রই গভীর ঘুম এসে গেল। কিন্তু সকালে ঘুম থেকে জেগে দেখল, তার সব ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হয়ে গেছে। সে শরীরে নতুন কর্মস্পৃহা ও সতেজতা অনুভব করল। প্রফুল্ল চিত্তে সে প্রতিদিনের মত আলী বিন সুফিয়ানের কাছে গেল, রুটিন রিপোর্ট সেরে সে চলে গেল ডিউটিতে।

প্রফুল্ল মনে সে সেই পাহাড়ী বিজন প্রান্তরে একাকী ঘুরে বেড়াতে লাগল। দুপুর পর্যন্ত ভালই কাটল তার, কিন্তু দুপুরের পর থেকে তার মনে প্রেতাত্মার চিন্তা চেপে বসল। তার শরীরের স্ফূর্তি ও শক্তি কমতে লাগলো। সন্ধ্যায় ক্লান্তি ও অবসাদের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেল সে। বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিবর্তে তার মনে এসে বাসা বাঁধল ভয় ও শংকা। উদাসিনতায় ছেয়ে গেল তার হৃদয়-মন। সে এই হতাশা দূর করার জন্য এটা-সেটা ভাবার চেষ্টা করল। ক্লান্তি দূর করার জন্য পায়চারী করতে লাগল। এভাবে চেষ্টা করতে করতে এক সময় মনের ভাব স্বাভাবিক হয়ে গেল।

ততক্ষণে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমে এসেছে। আকাশে চাঁদ নেই। অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। বাড়ী ফেরার তাড়া অনুভব করল মেহেদী আল হাসান। পশুগুলোকে জড়ো করে বাড়ীর পথ ধরতে যাবে, সহসা তার কানে ভেসে এলো দূরে কারো কান্নার স্বর। থমকে দাঁড়াল হাসান। কান পাতল কান্নার দিকে। পাহাড়ের দিক থেকে ভেসে আসছে কান্না। কোন মেয়ে গভীর বেদনায় ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে।

দীর্ঘক্ষণ এ কান্নার ধ্বনি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে শুনল হাসান। কান্নার শব্দ কমতে কমতে এক সময় একেবারে থেমে গেল। মেহেদী

আল হাসান যেখানে ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। ভাবলো, এটা কোন প্রেতাত্মার কান্না, যে প্রেতাত্মার কথা হেকিম সাহেব বলেছেন। মেহেদী আল হাসানের মন আবার হঠাৎ অজানা ভয়ে সংকোচিত হয়ে পড়ল। কিন্তু সে ভয়-ভীতি তাড়িয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টা করল।

একবার তার মনে হলো, আচ্ছা! এই প্রেতাত্মার সাথে কথা বললে কেমন হয়? সে ভাবল, যদি এই কান্না অন্য কোন সময় এবং স্বাভাবিক পরিবেশে হতো তাহলে আমি কি করতাম? নিশ্চয়ই কোন মেয়ের কান্না শোনার সাথে সাথে দৌড়ে তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে যেতাম। কিন্তু এখানে কারো সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। কারণ এই নির্জন পাহাড়ী অঞ্চলে কোন জীবন্ত মেয়ে এসে এভাবে কাঁদবে, এটা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই এটা ফেরাউনের যুগের কোন অশরীরি প্রেতাত্মার কান্নার ধ্বনি।

রাত একটু বেশী হওয়ার পরও সে গত দিনের মত হেকিমের কাছে গেল এবং তার কাছে নিজের অবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করল। তার অবস্থা ও কান্নার কথা শুনে হেকিম যেন গভীর চিন্তায় পড়ে গেল। কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে রইল। পরে মাথা তুলে বললো, 'এটা প্রেতাত্মারই কান্না। তবে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। আমি এক্ষুণি একটি তাবিজ দিচ্ছি। এটা সাথে রাখলে সে তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। রাতে আমি প্রেতাত্মাকে ডেকে পাঠাব। ওর কাছে জানতে চাইব, সে তোমার কাছে কি চায়? তার জওয়াবের ওপর ভিত্তি করে আমি পরবর্তী পদক্ষেপ

নেবো। কিন্তু তোমাকে একটি কথা বলে রাখি, তোমাকে ভয় করলে চলবে না। এই প্রেতাত্মা তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে, তাই সে তোমার কোন ক্ষতি করবে না। কিন্তু তুমি যদি প্রেতাত্মা থেকে পালানোর চেষ্টা করো, তবে তোমার ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।'

হেকিম তাকে একটি তাবিজ দিল। সে ওই তাবিজ তার বাম হাতের বাহুতে সযত্নে বেঁধে নিল।

'আমি রাতে তোমার জন্য আমল করবো।' হেকিম বললো, 'আগামী কাল সকালে তুমি আবার এখানে এসো। তখন তোমাকে বলে দেব, প্রেতাত্মা তোমার কাছে কি চায়? যে প্রেতাত্মা তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, সে শয়তান নয়। সে তোমার অনিষ্ট চাইলে গত রাতেই তোমার ক্ষতি করতে পারতো। তবুও আমি চেষ্টা করবো যেন তুমি এর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যাও।'

হেকিমের কথায় মেহেদী আল হাসান মনে মনে দারুণ ভয় পেল। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সীমাহীন দুশ্চিন্তা নিয়ে সে রাতের অন্ধকারে বাইরে পা রাখল। তার চোখের সামনে নাচতে লাগল একশ একটা ভয়াল আজদাহা। ভীতি ও আশংকার দোদুল্যমানতায় দুলতে লাগল তার হৃদয়।

০

পরের দিন মেহেদী আল হাসান আলী বিন সুফিয়ানের কাছ থেকে কিছু নির্দেশ পেল। সে তড়িঘড়ি করে হেকিমের নিকট

গেল। হেকিম তার অপেক্ষাতেই বসেছিলেন। তিনি তাকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেলেন ও তাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

'সে তোমার সাথে একবার দেখা করতে চায়।' হেকিম তাকে বললেন, 'সে তোমার সামনে আসবে, তোমার আসল রূপ দেখবে। তুমিও তাকে দেখতে পাবে। হয়ত সে প্রথম সাক্ষাতে তোমার সামনে এসে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। সে তো অন্য জগতের সৃষ্টি। সে এই জগতের লোকের সাথে দেখা করতে ইতস্তত: করতে পারে। যদি সে এমন ব্যবহার করে তবে তুমি পরের দিন সেখানে যাবে।'

'সে কোথায়?' মেহেদী জিজ্ঞেস করলো।

'সেখানেই, যেখানে তুমি প্রতিদিন যাতায়াত করো।' হেকিম বললেন, 'যেখানে তুমি আমাকে প্রথম দেখেছিলে, তুমি আজ রাতে সেখানে যাবে।'

'আপনিও কি আমার সাথে থাকবেন?'

'না!' হেকিম উত্তরে বললেন, 'সে আত্মা শুধু তার সাথেই দেখা দেয়, যাকে সে ভালবাসে। যদি কোন প্রেতাত্মার নজরে কোন মানুষ পড়ে যায়, সেই মানুষকে সে হত্যা করে। যে প্রেতাত্মা তোমার সাথে দেখা করতে চায়, সে খুবই ভাল মনের অধিকারী। তার কান্না শুনলেই তুমি বুঝতে পারবে, সে এক মজলুম মেয়ের কান্না। সে ভালবাসার কাঙাল। আমি যখন তাকে রাতে হাজির করলাম, সে শুধু অঝোরে কাঁদলো। আমাকে বিনয়ের সাথে বললো, 'ঐ যুবককে কিছুক্ষণের জন্য আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, আমি চিরদিনের জন্য বিদায় হয়ে যাবো।'

এই কথা যদি অন্য কেউ বলতো, তবে মেহেদী আল হাসান এতটা প্রভাবিত হতো না। কিন্তু শহরের নামকরা হেকিম ও কবিরাজের কথা সে অবিশ্বাস করে কি করে! সবাই জানে, তিনি জ্বীন-ভুত বশীভুত করতে পারেন। নিশ্চয়ই তিনি যা বলছেন তা সত্য। সেই মেয়ের কান্না আমি শুনেছি, হেকিম তো শুনেননি! তাহলে তিনি কি করে জানলেন, এ এক মজলুম মেয়ের কান্না! নিশ্চয়ই তিনি কাল রাতে সেই মেয়েকে ডাকিয়ে ছিলেন।

এই হেকিম যেমন বড় চিকিৎসক তেমনি মশহুর আলেম। তার বলার ভঙ্গী এমন চমৎকার যে, লোকেরা তার কথা মুগ্ধ হয়ে শোনে এবং বিশ্বাসও করে। মেহেদী আল হাসানও হেকিমের সব কথা বিশ্বাস করল। হেকিম তাকে আরো বলল, 'রাতে ঐ প্রেতাত্মার সাথে সাক্ষাৎ করার মধ্যে ভয়ের কিছু নেই। বরং এতে ক্ষতির পরিবর্তে তোমার লাভের সম্ভাবনাই বেশী।'

'আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। নিশ্চয়ই আমি তার সাথে দেখা করবো। রাতে যথা সময়ে আমি সেখানে চলে যাবো। আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন।' বলল মেহেদী আল হাসান।

'হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তোমার মঙ্গলের জন্য দোয়া করবো। তবে একটা ব্যাপারে তোমাকে সাবধান করা দরকার মনে করছি।'

'কি?' ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করল মেহেদী আল হাসান।

'কারো সাথে এই প্রেতাত্মার সাক্ষাতের বিষয় নিয়ে আলাপ করবে না। যদি তুমি এই গোপন বিষয় ফাঁস করে দাও, তবে

তোমার ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। তুমি মাটির মানুষকে ধোঁকা দিতে পারো। কিন্তু অদৃশ্যলোকের কোন আত্মার গোপন কথা যদি ফাঁস করে দাও তবে আমি বলতে পারি না, তোমার শরীরের কোন দু'টি অঙ্গ চিরদিনের জন্য অকেজো হয়ে যাবে। দু'টি পা অবশ হয়ে যেতে পারে অথবা দু'টি হাত কিংবা দু'টি চোখ থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়ে যাবে তুমি।'

মেহেদী আল হাসান ভয়ে একেবারে সংকুচিত হয়ে গেল। বলল, 'না, এ কথা আমি কাউকে বলব না। আমি চিরদিনের জন্য পঙ্গু হতে চাই না।'

'মানুষের এই এক দোষ। সে তার মনের মধ্যে কথা গোপন রাখতে পারে না। যদি পারতো তবে অহেতুক বিপদে জড়িয়ে পড়তে হতো না তাকে। তোমাকে তাহলে একটা গোপন তথ্য বলেই ফেলি। হয়তো এর থেকে তুমি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। এখানে দু'জন সামরিক অফিসার রাতের বেলায় অজ্ঞাতে মারা গেছে, শুনেছো নিশ্চয়ই। কেউ বলতে পারে না, তারা কেমন করে মারা গেছে। কাল রাতে যে প্রেতাত্মা এসেছিল সে আমাকে বলেছে, তাদের দু'জনকে নাকি প্রেতাত্মারাই হত্যা করেছে। কারণ তারা নাকি প্রেতাত্মাদের গোপন ভেদ খুলে দিতে চেয়েছিল। এবার বুঝ অবস্থা!'

'সেটা কেমন করে? অদৃশ্য জগতের খবর অফিসাররা জানবে কেমন করে?' মেহেদী আল হাসান মুর্খ রাখালের মতই প্রশ্ন করে বসলো।

কিন্তু সামরিক অফিসারদের প্রসঙ্গ আসার সাথে সাথেই মেহেদী আল হাসান সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। এতক্ষণের

সরলতা ও ভক্তি-বিশ্বাসের জায়গায় এসে আসন নিয়েছিল বিচক্ষণ গোয়েন্দার প্রজ্ঞা। সে এই তথ্যের জন্যই তো এতদিন ধরে পাহাড় অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হেকিমের এ কথায় মুহূর্তে সে একজন রোগী থেকে গোয়েন্দায় পরিণত হয়ে গেল। বুঝতে পারল, সে আসল জায়গাতেই এসেছে।

দুই কমাণ্ডারের মৃত্যুর গোপন তথ্য উদ্ধারের জন্য সে হেকিমের কাছে প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে মারতে শুরু করল।

'আমি এ গোপন রহস্য কাউকে বলতে পারি না।' হেকিম বললো, 'যেটুকু বলার ছিল তাই বললাম। তুমি কিন্তু সম্পূর্ণ নীরব থাকবে। তুমি এই গোপন তথ্য কাউকে বলবে না।'

'জ্বী না, বলব না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, আমি কাউকে বলব না বলার পরও কেন আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমার কি প্রাণের মায়া নেই?'

'দেখো, তোমাকে সতর্ক করার জন্যই এত কথা বললাম আমি। জ্বীন-ভুত বশীভূত করা বড় ভয়ংকর কাজ। এদের সাথে গড়বড় করলে ওরা কাউকে ছাড়ে না। তোমাকে যে এত করে সতর্ক করছি, তা কেবল তোমার স্বার্থে নয়, এর পিছনে আমার নিজেরও স্বার্থ রয়েছে। কারণ আমি এই সব প্রেতাত্মার ইচ্ছা ও অনিচ্ছার সাথে জড়িয়ে পড়েছি। যদি আমি তাদের অসন্তুষ্ট করি, তবে আমার এ বিদ্যা অকেজো হয়ে যাবে। প্রেতাত্মারা আমাকেও সেই শাস্তি দিবে, যেমন শাস্তি দেয় তারা নিজ শত্রুকে। তুমি কোন ভুল বা বেয়াদবী করলে সেই রাগে ওরা যদি তোমার সাথে আমাকেও শাস্তিযোগ্য ভাবে, তবে এমন কোন আদালত নেই যেখানে গিয়ে আমি

সুবিচার প্রার্থনা করতে পারবো। তাই আমি চাই তুমি সহিসালামতে তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করে নিজে বাঁচো এবং আমাকেও বিপদের হাত থেকে রক্ষা করো।'

'ওদের ইচ্ছাটা কি?'

'যে আত্মা তোমার জন্য কেঁদেছে, সে আমাকে বলেছে, নির্জনে কিছুক্ষণের জন্য সে তোমার সাক্ষাৎ চায়। আমি যদি তার ইচ্ছা পূরণ করি তবে সেও আমার আশা পূরণ করবে।'

'যদি আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করি, তবে কি হবে?'

'সে প্রেতাত্মা তোমার আত্মার উপরে ছায়া হয়ে বিস্তার করবে।' হেকিম উত্তর দিল, 'তুমি আমাকে যে অসুবিধার কথা বলেছ, তা কোন শারীরিক অসুবিধা নয়। এটা রূহানী বা আধ্যাত্মিক সমস্যা। সে তোমার উপর এখনও পূর্ণভাবে প্রভাব বিস্তার করেনি। কারণ তুমি অতিশয় ভাল লোক। যদি তুমি ভালো লোক হও, তবে তোমার ভালোর পরিণাম ফল তোমারই কাজে আসবে। তুমি আমার কাছে সেই অসুবিধার কথা বলেছ, আল্লাহ জাল্লে শানুহু যার উপরে রহমত বর্ষণ করতে চান, তার জন্য আল্লাহ কোন লোককে মাধ্যম বা অছিলা বানিয়ে নেন। এই কেরামতি আল্লাহর নিজস্ব ব্যাপার। তাই তুমি আমাকে সেখানে দেখতে পেয়েছিলে এবং আমরা পরস্পর পরিচিত হলাম। এই কল্যাণকর কাজে ভয় পেও না। যদি তুমি এই প্রেতাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো, তবে সে তোমাকে এই দুনিয়াতে অনেক উপকার করবে। একটা উপকার এটাও হতে পারে যে, সে কোন সুন্দরী মেয়ের রূপ ধরে সশরীরে জীবন্ত মানুষের মত তুমি যখন চাইবে তোমার

সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। তখন তুমি তাকে নিয়ে স্ত্রীর মত সংসার জীবন-যাপন করতে পারবে। যদি সে তোমার উপর আরও বেশী সদয় হয়, তবে বিশ্বাস করো, ফেরাউনের কবর থেকে গুপ্তধন এনে দেবে। অথবা এমনও হতে পারে, তুমি সেই গুপ্তধন নিয়ে মিশর থেকে দূরে কোথাও চলে যাবে। সেখানে বাদশাহর মত মহল বানিয়ে শান্তিময় জীবন কাটাবে।'

'কবে তার সাক্ষাৎ পাবো?' মেহেদী উদগ্রীব কণ্ঠে জানতে চাইল।

'আজ রাতেই। মধ্য রাতের একটু আগে বা পরে তাকে তুমি সেখানে পাবে!' হেকিম বললেন।

হেকিম তার গলায় আরও একটি তাবিজ বেঁধে দিলেন এবং মাথা ও শরীরে হাত বুলিয়ে ঝাড়ফুঁক করলেন।

মেহেদী আল হাসান অপূর্ব অনুভূতি নিয়ে সেখান থেকে উঠলো। তারপর প্রতিদিনের মত ডিউটিতে চলে গেল সে। বিকেল পর্যন্ত সেখানেই কাটিয়ে দিল। কিন্তু সূর্য অস্ত যাওয়ার বেশ আগেই সে তার ঠিকানায় ফিরে এল।

০

রাত গভীর হলো। মেহেদী আল হাসান মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে পৌঁছে গেল সেই কাংখিত জায়গায়। কিন্তু এখন সে ডিউটিতে আসেনি, এসেছে তার স্বপ্নের নারী আত্মার সাথে দেখা করতে।

অন্ধকার রাত। চারদিকে সুনসান নির্জনতা! জঙ্গলের পাশে

পাহাড়ের এক টিলায় চড়ে বসল মেহেদী। আশেপাশে কোন জনমানব নেই। থাকার কথাও নয়। অন্ধকার এমন গাঢ় যে আশেপাশে কিছুই দেখা যায় না। গা ছমছম করা ভূতুড়ে পরিবেশ। স্বাভাবিকভাবেই এমন পরিবেশ মানুষের অন্তরে ভয় ধরিয়ে দেয়। কিন্তু মেহেদীর মোটেও ভয় লাগছিল না। হেকিমের কথা তার মনে সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিল। তার বাহুতে এখনও ঝুলছে হেকিমের বেঁধে দেয়া তাবিজ। যে তাবিজ তাকে সব রকম বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা করবে বলে বিশ্বাস করে মেহেদী। তাছাড়া সে আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী যুবক হিসাবেই সবার কাছে পরিচিত।

সময় গড়িয়ে চলল। হেকিমের নির্দেশিত জায়গায় বসে আছে মেহেদী। এখনো কারো সাড়াশব্দ পায়নি সে। উদগ্রীব হয়ে সে অপেক্ষা করছিল, কখন সেই নারী আত্মা মনুষ্য মূর্তি ধরে তার সামনে আবির্ভূত হবে।

সে যেখানে বসে আছে তার পিছনেই বিরাট এক পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে ঝাকড়াচুলো বড় বড় বৃক্ষ। বাঁ দিক থেকে শুরু হয়েছে দুর্গম অরণ্যাঞ্চল। কেবল ডানপাশটাই যা একটু খোলামেলা। বাতাস বইছে। সেই বাতাসের ঝাপটায় দুলছে বৃক্ষের ডালপালা। বাঁ দিক থেকে শনশন, মড়মড় আওয়াজ আসছে বাতাসের ঝাপটায় জঙ্গলের বৃক্ষরাজির দোলা থেকে। সামনের গাছগুলো এমনভাবে নড়ছে, যেন হেলেদুলে এগিয়ে আসছে কোন সুবিশাল ভূত। বাতাসের এই শব্দ ও বৃক্ষের নড়াচড়া দেখে মেহেদী আল হাসানের মত বীর যোদ্ধার অন্তরও ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে

উঠল।

বসে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে উঠল মেহেদী আল হাসান। সে বসা থেকে উঠে দাঁড়াল এবং খানিকক্ষণ পায়চারী করল। এমন সময় সেই কান্নার সুর ভেসে এলো, যে সুর সে আগে একবার শুনেছিল। সে সেই কান্নার শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল। কয়েক কদম এগুনোর পর হঠাৎ করেই কান্না আবার থেমে গেল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আল মেহেদী। কিছুক্ষণ নীরব থাকলো। শুনতে চেষ্টা করল কোথাও কোন আওয়াজ হয় কিনা। কিন্তু না, চারদিক সুনসান, নিশ্চুপ। সে একটু এগিয়ে গিয়েই আবার থেমে গেল। কারণ হঠাৎ করেই সেই কান্নার সুর আবার ভেসে এলো। তবে এবার সামনে থেকে নয়, আওয়াজটা এলো পিছন থেকে।

এবার আওয়াজটা অনেক দূর থেকে এলো। ভাবনায় পড়ে গেল মেহেদী। সে ঘুরে পিছন ফিরে আবার হাঁটা ধরল। কান্নার রেশ আরো জোরালো হল। বেশ কিছুটা পথ মাড়িয়ে এলো মেহেদী, আবারো কান্না থেমে গেল।

মেহেদী আল হাসান উচ্চস্বরে বললো, 'তুমি কি আমাকে দেখা দিবে নাকি আমাকে শুধু ভয়ই দেখাতে থাকবে?'

তার নিজের শব্দই পাহাড়ে প্রান্তরে আঘাত খেয়ে আবার ফিরে এল, কিন্তু কান্নার আওয়াজ বা এই প্রশ্নের কোন জবাব কেউ দিল না। একবার নয়, কয়েকবার সে এই প্রশ্ন করল, কিন্তু প্রতিবারই তার শব্দ ফিরে এসে তাকেই আঘাত করল। ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হলো তার কণ্ঠের সে আওয়াজ, কিন্তু সব বৃথা চেষ্টা, কেউ তার প্রশ্নের জবাব দিল না।

সেই শব্দ অন্ধকারে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। নিরূপায় হয়ে আবার মটিতে বসে পড়ল মেহেদী। তখন এক মেয়েলি কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পেল সে। মেয়েটি বলছে, 'হে সুন্দর যুবক! তুমি ওখানেই বসে থাকো। আমি প্রাণ ভরে তোমাকে দেখি। আজ দুই হাজার বছর ধরে আমি তোমার পথ পানে চেয়ে আছি। এতদিন পর প্রভু আমার প্রতি সদয় হলেন। আমি তোমাকে দেখতে পেলাম।'

মেহেদী আল হাসান এ শব্দও কয়েকবার শুনতে পেল। তারপরে আবার সব নীরব হয়ে গেল।

মেহেদী আল হাসান কিছুক্ষণ ওখানেই চুপচাপ বসে রইল। পরে আবার চিৎকার করে বলল, 'তুমি কি একাই আমাকে দেখবে? আমি কি কখনো তোমাকে দেখতে পাবো না?'

'তুমি কি আমাকে সত্যি দেখতে চাও? বলো, তোমার হৃদয় থেকে বলো, তুমি কি সত্যি দেখতে চাও?'

'হ্যাঁ, চাই।'

'তাহলে ওঠো। এগিয়ে এসো আমার কাছে।'

এইভাবে দুই দিক থেকে কথার আদান প্রদান হলো। মেয়েটির মিষ্টি আহ্বান আবার শুনতে পেল মেহেদী, 'কই, ওঠো, এগিয়ে এসো আমার কাছে!'

মেহেদী আল হাসান সব দ্বিধা ও ভয়ভীতি দূর করে উঠে দাঁড়াল। সে ওই পাহাড়ের দিকে রওনা দিল, যেদিক থেকে মেয়েটির কণ্ঠ ভেসে আসছিল।

যেতে যেতে সে সেই গুহার কাছে গিয়ে পৌঁছল। গুহার ভেতর থেকে আলো আসছিল, সে আলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

সে গুহামুখে পৌঁছতেই আলোটি বিজলীর মত চমক দিয়ে ফট করে নিভে গেল। সেই ক্ষণিক আলোয় সে নিজেকে সুড়ংয়ের মুখে আবিস্কার করল।

হতভম্ব হয়ে সে সেই গুহামুখে দাঁড়িয়ে রইল। গুহার ভেতর নিকষ কালো অন্ধকার। এই অন্ধকারের ভেতর কোন মানুষ আছে কি নেই বুঝার উপায় নেই।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত, তার পরই সুড়ংয়ের অনেক ভেতরে একটি ক্ষুদ্র আলোর শিখা দেখা দিল। আস্তে আস্তে সে আলো বিস্তারিত হতে হতে একদম গুহার মুখ পর্যন্ত চলে এলো। মেহেদী আল হাসান অনেক দূরে সুড়ংয়ের ভেতর একজন মানুষকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেল। মানুষটি যে পুরুষ নয়, নারী তা এই দূর থেকেও বুঝা যাচ্ছে। সেই নারীদেহ তরঙ্গিত ছন্দ তুলে সামনে এগিয়ে আসছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত সেদিকে তাকিয়ে আছে মেহেদী আল হাসান। সেই নারী তার থেকে কম-বেশী পঞ্চাশ গজ দূরে এসে থামল।

সে লক্ষ্য করে দেখলো, মেয়েটি অনিন্দ্য সুন্দরী। তার চেহারা সুরত অতি মনোরম। সমস্ত শরীর কাফনের মত একদম সাদা কাপড়ে জড়ানো। হঠাৎ এ দৃশ্য দেখে মেহেদী আল হাসান ভয় পেয়ে গেল। তার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেল। হাত-পা কাঁপতে লাগল।

মেয়েটি হাসানের এ অবস্থা দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, 'ভয় পাচ্ছো কেন যুবক। আমি তোমার কোন ক্ষতি করবো না, আমাকে ভয় পাওয়ারও কিছু নেই! আমি দুই হাজার বছর ধরে তোমার পথ চেয়ে আছি। তোমার তো আজ

খুশীর দিন। তাহলে তুমি অমন ভয় পাচ্ছো কেন? এসো, এগিয়ে এসো আমার দিকে।'

মেহেদী আল হাসান তার দিকে আরও একটু অগ্রসর হলো। কয়েক কদম এগিয়েছে, কাফনের মধ্য থেকে একটি হাত বের হয়ে এলো। হাতটি মেহেদী আল হাসানের দিকে বাড়িয়ে এমন ইশারা করলো, যেন সে আর সামনে না যায়। ইশারা পেয়েই মেহেদী আল হাসান আবার দাঁড়িয়ে গেল। আলোও নিভে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মেহেদী অপেক্ষা করতে থাকলো, ভাবলো, আলো হয়তো আবার জ্বলে উঠবে। সে আবার সেই কাফনে ঢাকা মেয়েটাকে দেখতে পাবে। কিন্তু আলো জ্বলার পরিবর্তে এবার ভেসে এল মেয়েটির কণ্ঠস্বর, এ স্বর আগের মত মিষ্টি মধুর নয়। রুক্ষ ও কর্কশ কণ্ঠে মেয়েটি বলল, 'চলে যাও হে অবিশ্বাসী যুবক। তোমাকে বিশ্বাস করা চলে না। তোমার অন্তর ভালবাসাহীন। তুমি চলে যাও, চলে যাও তুমি।'

'আমাকে তুমি বিশ্বাস করো, আমার উপর ভরসা রাখো!' মেহেদী আল হাসান অনুনয় করে বললো, 'আমি অবিশ্বাসী নই। আমার অন্তর ভালবাসা ও মমতাহীন নয়।' সে কথা বলছিল আর অন্ধকারের মধ্য দিয়েই দ্রুত সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'আমি তোমার জন্যই এখানে এসেছি। তোমাকে দেখার জন্যই নির্জন অন্ধকারের মধ্যে একাকী ছুটে এসেছি। আমাকে বিশ্বাস করো, দেখা দাও আমার কাছে এসে।'

সুড়ংয়ের গহীন থেকে আওয়াজ এলো, 'এখনো তোমাকে

আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। দুনিয়ার মানুষ সব প্রতারক, তুমিও প্রতারক।'

'না, আমি প্রতারক নই। আমাকে বিশ্বাস করো, আমি সত্যি বলছি।'

'তাহলে তুমি আগামীকাল এসো। ভয়ভীতি দূরে ফেলে এসো। অন্তরে প্রীতি ও মহব্বত নিয়ে এসো। যদি তুমি প্রতারক না হও তাহলে তুমি আমার দেখা পাবে। কিন্তু মনের মধ্যে ভয় ও সন্দেহ নিয়ে এলে, যেমন আজ এসেছো, তুমি কখনোই আমার দেখা পাবে না। আর যদি তুমি না আসো তবে তুমি ও তোমার ওস্তাদ সেই কবিরাজের কপালে যে দুর্ভোগ আছে তা আমি খণ্ডাতে পারবো না। আজ চলে যাও। মনকে পরিষ্কার করে কাল এসো।'

মেহেদী আল হাসান এরপরও অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। বার বার ডাকল সেই মেয়েকে, কিন্তু মেয়েটির আর কোন সাড়াশব্দ পেল না। সে অন্ধকারের মধ্যেই সুড়ংয়ের ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগল এবং একসময় সুড়ংয়ের অপর প্রান্তে চলে এল। সুড়ংয়ের ভিতরের চেয়ে বাইরের অন্ধকার কিছু কম। জমাট অন্ধকারের ভেতর দিয়ে হেঁটে সে সুড়ংয়ের মুখে এসে পৌঁছল। বাইরে আবছা আলোর মাঝে একটি লম্বা ছায়া দেখতে পেল। সাদা কাফনে জড়ানো একটি মেয়ে। সে গুহার বাইরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল। মেহেদী আল হাসান দৌড় দিল। কিন্তু পায়ে বাঁধা পেয়ে পড়ে গেল। উঠে আবার দৌড় দিল। কিন্তু কোথায় কাফন, কোথায় মেয়ে! নিরেট পাহাড় ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই। সে

সুড়ংয়ের মুখে গিয়ে শব্দ করে ডাকলো, তার আওয়াজই ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে এলো তার কাছে। তারপর আর কোন আওয়াজ নেই। কান্নার শব্দ নেই, হাসির ঝরণা নেই, নেই কোন কথামালা।

একটু আগে সফেদ কাপড়ে-ঢাকা যে মেয়ের সাথে সে কথা বলেছিল কোথাও সে নেই।

নিরাশ হয়ে ফিরে চলল মেহেদী আল হাসান। ফিরে চলল সুড়ং পথেই। সুড়ংয়ের মাঝামাঝি এসেছে এ সময় সুড়ংয়ের মুখে আলো দেখতে পেল, কিন্তু সে আলোতে কোন মানুষের ছায়াও ছিল না।

আলো নিভে গেল। মেহেদী আল হাসান আলোহীন অবস্থাতেই সুড়ং থেকে বেরিয়ে গেল। তার সামনে কিছু দূরে একটু আলো দেখা গেল। সে ওই আলোর কাছে গিয়ে দেখল, কে যেন পাথরের আড়ালে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে।

মেহেদী আল হাসান সেখানে দাঁড়িয়ে অনেক কিছু চিন্তা করলো। শেষে যেদিক দিয়ে এসেছিল, সে দিকে চলে গেল। ধীরে ধীরে পাহাড়ী এলাকা থেকে বের হয়ে এল মেহেদী। তার উট বাইরে এক গাছের সাথে বাঁধা ছিল। সে উটের উপর সওয়ার হলো এবং কায়রোর দিকে যাত্রা করলো।

তার মানসিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। একে ভয় বলা যাবে না কিন্তু তার মন ভরা ছিল উৎকট অস্থিরতা ও পেরেশানী। সে ওই আলো দু'টি সম্পর্কে চিন্তা করছিল। একটা সেই আলো, যার সামনে সফেদ কাপড়ে ঢাকা মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল। আরেকটি আলো, যেটি উপরে সে দেখে এসেছে।

উপরের আলোটা আগুন ছিল। কিন্তু মেয়েটি যে আলোতে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই আলোতে আগুন ছিল না। কারণ আলো জ্বলা স্থানটি সে দুইবার অতিক্রম করেছে। সেখানে আগুন জ্বালালে তার কিছুটা উত্তাপ তো সে অবশ্যই পেতো! তাহলে সেটা কিসের আলো ছিল? প্রশ্নটার কোন জবাব সে তাৎক্ষণিকভাবে পেলো না।

রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। নিজের আস্তানায় ফিরে এল মেহেদী আল হাসান। বিছানায় গেল ঘুমোবার জন্য, কিন্তু তার কিছুতেই ঘুম এলো না। বার বার সেই কাফনে জড়ানো মেয়েটির চেহারাই তার সামনে ভেসে উঠতে লাগলো। বিছানায় শুয়ে সে কেবলই ছটফট করতে লাগলো।

০

অনেক রাতে শোয়ার পরও অভ্যাস অনুসারে সকাল সকালই ঘুম থেকে উঠলো সে। তারপর প্রাত্যহিক কাজ সেরে আলী বিন সুফিয়ানের কাছে গেল নতুন নির্দেশ নিতে। আলী বিন সুফিয়ান তার ডিউটির স্থান পরিবর্তন করে তাকে শহর থেকে দূরে অন্য এক জায়গায় ডিউটি করতে বলল।

'আরও কিছু দিন আমাকে এখানেই ডিউটি করার অনুমতি দিন। এতদিন এখানে কাজ করছি, মনে হয় একটি সূত্রের কাছাকাছি চলে এসেছি প্রায়।' মেহেদী আল হাসান বললো, 'আমি আশা করছি, এই পাহাড়ী এলাকায় আমি এমন কিছু পাবো, যা আপনাকে চমৎকৃত করবে। আমাকে আর দু'তিন

দিন সময় দিন। এর মধ্যেই ইনশাআল্লাহ আমি আপনাকে নতুন কোন সুসংবাদ শোনাতে পারবো আশা করি।'

আলী বিন সুফিয়ান তার আবেদন উপেক্ষা করলো না। কারণ সে আনাড়ী গোয়েন্দা নয়। সে এক বিশ্বস্ত ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত অফিসার। সে যখন চাইছে তখন তাকে একটু সুযোগ দেয়া দরকার। আলী বিন সুফিয়ান এ নিয়ে তার সাথে কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন। পরে চিন্তা-ভাবনা করে বললেন, 'তোমার আবেদন মঞ্জুর করা হলো। আশা করি তুমি সাবধানে কদম ফেলবে এবং নতুন সংবাদ নিয়েই ফিরবে।'

মেহেদী আল হাসান প্রেতাত্মার সাথে সাক্ষাৎ করার আগে সে এলাকা ছাড়তে চাচ্ছিল না! এই প্রথম সে তার দায়িত্ব চেয়ে নিল। আলী বিন সুফিয়ানের যদি সামান্যতম সন্দেহও হত যে, সে কোন-চক্রে পড়ে তার ডিউটি পরিবর্তন করতে চাচ্ছে, তবে তাকে কখনোই সেখানে যাওয়ার অনুমতি দিত না। এক দক্ষ গোয়েন্দা নিজেকে এমন ভয় ও বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, যেখানে তার জীবন যাওয়ারও ঝুঁকি ছিল।

মেহেদী আল হাসান হেকিমের কাছে গেল। তার কাছে রাতের ঘটনা সব খুলে বলল। হেকিম তার কাহিনী শুনে চোখ বন্ধ করলো, মুখে বিড় বিড় করে কি যেন বলল। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে মেহেদী আল হাসানের চোখে চোখ রাখলো।

'আজ রাতে আবার সেখানে যাও।' হেকিম তাকে বললো, 'সেই পবিত্র জগতের সৃষ্টি এই অপবিত্র পৃথিবীর মানুষের ধোঁকায় পড়তে চায় না, ভয় পায়। তুমি সেখানে ভয় পাব্যর

মত কিছু করবে না, যাতে আজও সে দেখা দিয়ে সাক্ষাৎ না করে অদৃশ্য হয়ে যায়। তুমি অধৈর্য হয়ো না। সে তোমার সাথে সাক্ষাতের জন্য অধীর হয়ে আছে। অবশ্যই সাক্ষাৎ হবে। যদি এই সাক্ষাতে তোমার কোন উপকার না হয়, তবে আমি কেন সেখানে তোমাকে পাঠাতে যাবো! নিশ্চয়ই এই সাক্ষাত তোমার জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে থাকবে।'

মেহেদী আল হাসান চলে গেল। রোজকার মত পশুর পাল নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে ছেড়ে দিয়ে সে উঠে গেল পাহাড়ে। সেখানে সে ঘোরাফেরা করতে লাগল। তার চোখে পড়ল সেই গুহা-মুখ। সে সেই গুহার কাছে গেল। তাকাল চারদিকে। তারপর সুড়ংয়ের মধ্যে ঢুকে গেল। সুড়ংয়ের মুখে সে মাটিতে একটি কাপড়ের টুকরো পড়ে থাকতে দেখলো। সে কাপড়ের খণ্ডটি উঠিয়ে নিল। এক ইঞ্চি চওড়া হাতখানেক লম্বা এক টুকরো ফিতা। সে কাপড়ের ফিতাটাকে গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলো। ফিতাটি পকেটে রেখে সে এবার সুড়ংয়ের মধ্য দিয়ে হাঁটা শুরু করলো। এক পাশ দিয়ে ঢুকে সে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে এলো। সে সেই উঁচু জায়গাটির কাছে গেল, যেখানে পাথরের আড়ালে সে আগুন জ্বলতে দেখেছিল।

এরপর সে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো। তখন অদৃশ্য থেকে এক পুরুষ কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো, 'উপরে যেও না। যার জন্য তুমি এসেছো, সে রাতে আসবে।' এ শব্দটি গুঞ্জরিত হয়ে বার বার তার কানে বাজতে লাগলো।

তখন আবার শব্দ হলো, 'আমাদের পৃথিবীতে এসে খোঁজাখুঁজি করবে না। যে পথে এসেছো সেই পথে ফিরে যাও।'

মেহেদী আল হাসান থেমে গেল। তার এমন মনে হতে লাগলো, যেন সে শব্দ তার আশেপাশে ঘুরছে। সে আর উপরে গেল না। সে অভিভূত হয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলো। সে ভাবলো, তার এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে এখানকার প্রেতাত্মারা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। অসন্তুষ্ট হলে তারা তার ক্ষতি সাধন করে বসতে পারে।

সে আবার গুহার ভেতর ঢুকে গেল এবং সুড়ংয়ের ভেতর দিয়ে হেঁটে অপর পাশ দিয়ে বাইরে চলে এল। তারপর হেঁটে হেঁটে সে তার পশুগুলোর কাছে চলে এল। সেখানে এক পাথরের ওপর বসে সে চিন্তা করতে লাগলো, এর রহস্যটা কি? কে আমাকে উপরে যেতে নিষেধ করলো? কেন নিষেধ করলো? এই দিনের বেলায় যেখানে কোন জনমনিষ্যি নেই সেখানে কিভাবে স্পষ্ট আওয়াজে তাকে উপরে যেতে বারণ করলো? লোকটার কথা থেকে বুঝা যায়, সে আমার প্রতিটি কার্যকলাপ দেখছে, তাহলে আমি তাকে দেখলাম না কেন? তাহলে কি এখানে কোন মানুষ নেই? অদৃশ্য আত্মাই আমাকে এভাবে বারণ করলো? কিন্তু কেন? উপরে কি আছে, যা ওরা আমাকে দেখতে দিতে চায় না?

দিনটা তার এই সব চিন্তাতেই কেটে গেল। শেষে রাতে আবার এখানে আসার জন্য বিকেলে তাড়াতাড়ি তার ঠিকানায় ফিরে গেল।

সূর্য অস্ত যাওয়ার পর সে আবার রাখালের পোষাক পরে পাহাড়ী অঞ্চলে রওনা দিল। এভাবেই সে প্রতিদিন যায়। সাধারণ পোষাক পাল্টে মরু রাখালের বেশেই সে বরাবর হেকিমের সাথেও দেখা করেছে। এটাই তার ডিউটির পোষাক। সে যখন ডিউটিতে যায়, তখন সে লম্বা একটা খঞ্জরও সঙ্গে নিয়ে যায়। গতকাল তার সঙ্গে খঞ্জর ছিল বলেই রাতে সেই নারী তার সাথে সাক্ষাত করেনি। হেকিম বিষয়টি লক্ষ্য করে তাকে বলেছিল, 'তুমি কি এই খঞ্জর নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে?'

মেহেদী আল হাসান হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লে তিনি কড়া ভাষায় নিষেধ করে বলেছিলেন, 'খবরদার, যখন রাতে প্রেতাত্মার সাথে দেখা করতে যাবে তখন সঙ্গে কোন অস্ত্রশস্ত্র রেখো না। অস্ত্রকে ওরা ঘৃণা করে। অস্ত্র মানুষের বুক থেকে প্রেমের শক্তি কেড়ে নেয়। ফেরাউন অস্ত্রের মুখে ওদের জোর করে ধরে এনেছিল। তাই ওরা অস্ত্রধারী কারো সাথে সাক্ষাত করে না। আজ রাতে তুমি যখন ওখানে যাবে তখন সঙ্গে কোন অস্ত্র নিও না।'

রাখালের পোষাক পরে সে লম্বা ছোরাটির দিকে তাকাল ছোরাটি দেয়ালের সাথে ঝুলানো। সে ছোরাটি দেখলো হেকিমের সাবধান বাণী মনে পড়ে গেল তার। সে গভী চিন্তায় পড়ে গেল। হেকিমের নির্দেশ অনুযায়ী খঞ্জর বা কো অস্ত্রই সাথে নেয়া যাবে না। কিন্তু নিরস্ত্র অবস্থায় যাওয়াটা কি

ঠিক হবে? অনেক চিন্তা-ভাবনার পর জীবনের নিরাপত্তার কথা ভেবে সে খঞ্জরটি সঙ্গে নেয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করল। সে দেয়াল থেকে খঞ্জরটি পেড়ে কাপড়ের ভেতর কোমরের সাথে সেটি বেঁধে নিয়ে বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

গন্তব্য স্থানে পৌঁছে সে উটকে বসিয়ে দিল। তারপর পায়ে হেঁটে রওনা দিল সুড়ংয়ের মুখের দিকে। সহসা সে পিছনে কারো পদধ্বনি শুনতে পেল। থেমে গেল সে। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল সেই পদধ্বনি। মেহেদী সামনে না এগিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল।

একটু পর উপর থেকে পাথর গড়ানোর শব্দ শুনতে পেল। পাথর পতনের সেই ধ্বনি তেমন বিকট ছিল না। কিন্তু এমন নিঝুম ও খাঁড়া পাহাড়ে পাথর পতনের আওয়াজ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে নিচ পর্যন্ত গড়িয়ে চললো। পাথর পতনের আওয়াজ শেষ হতেই একটি গুঞ্জন ধ্বনি ভেসে আসল গুহার ওদিক থেকে। মনে হল, কেউ যেন ফোঁপাচ্ছে ও কাঁদছে। আস্তে আস্তে সেই কান্নার ধ্বনি জোরালো হলো। মেহেদী আল হাসানের কানে সেই কান্নার ধ্বনি আঘাত করতেই সে বলে উঠল, 'কেঁদো না, আমার সামনে এসো। আমার দুনিয়া অপবিত্র হতে পারে, কিন্তু আমি অপবিত্র নই।'

'তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।' কান্না কাতর কণ্ঠেই কথাটা বলল কোন নারী। সে আওয়াজে ছিল বিনয় ও নম্রতা।

হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গেই তা আবার নিভেও গেল। আলোটি জ্বলে উঠেছিল সুড়ংয়ের একেবারে মুখে। মেহেদী আল হাসান দ্রুত পদক্ষেপে সুড়ংয়ের দিকে এগিয়ে

গেল।

সুড়ংয়ের একদম কাছাকাছি গিয়ে এক বিরাট পাথরের পিছনে বসে নিজেকে লুকিয়ে ফেললো সে। সেখান থেকে উপরের দিকে তাকালো, যেখানে গত রাতে আগুন জ্বলতে দেখেছিল। একটু পর আজও সেখানে আগুন জ্বলে উঠল। সে নিজেকে মাটির সাথে একদম মিশিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সুড়ংয়ের মুখের কাছে চলে এল। তারপর নিজেকে ছুঁড়ে মারল সুড়ংয়ের ভেতর।

সুড়ংয়ে পৌঁছে যতটা সম্ভব পাথরের আড়ালে নিজেকে গোপন করে চুপচাপ বসে থাকলো। অন্ধকারে তার চোখ সহনীয় হয়ে উঠলে সে এদিক-ওদিক দৃষ্টি মেলে নীরবে দেখতে লাগলো। গুহা থেকে আগুনটা সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না, তবে আগুনের আভা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

সুড়ংয়ের ভেতর থেকে মেয়েটির কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'হে সুন্দর যুবক, দুই হাজার বছর ধরে তোমার পথ পানে চেয়ে আছি। তুমি আমার সামনে এসো।' সুড়ংয়ের ভেতর এ কথা বার বার ধ্বনি প্রতিধ্বনি হতে লাগল।

মেহেদী আল হাসান সেই কণ্ঠস্বরের উদ্দেশ্যে নিঃশব্দে পা বাড়াল। অন্ধকারে সুড়ংয়ের দেয়াল হাতড়ে ভেতরের দিকে চলতে লাগলো সে। তার মনে পড়লো, হেকিম তাকে বলেছে, 'সাথে কোন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যেও না। নিলে সে মেয়ের আত্মা তোমার সামনে আসবে না।' তার সঙ্গে এখন দেড় ফুট লম্বা খঞ্জর আছে, অথচ মেয়েটি কথা বলছে, ডাকছে তাকে। সে আরো অগ্রসর হলো এবং সুড়ংয়ের মাঝামাঝি পৌঁছে

গেল। সুড়ংটা প্রশস্ত। দেয়াল হাতড়ে সে এগুচ্ছে, [illegible] সময় তার মনে হলো, সামনে থেকে কেউ এগিয়ে আসছে। সে দেয়ালের সাথে পিঠ লাগিয়ে রুদ্ধশ্বাসে আগন্তুকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

সুড়ংয়ের ভেতর গাঢ় অন্ধকার। নিজের হাত-পা পর্যন্ত দেখা যায় না। ফলে আগন্তুক পুরুষ না নারী তা যেমন সে দেখতে পারল না, তেমনি আগন্তুক ঠিক কতটা দূরে তাও নিশ্চিত হতে পারছিল না। সহসা তার মনে হল, কেউ তার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

তাকে পেরিয়ে মেয়েটি আরো দু'কদম এগিয়ে গিয়ে থামল। থেমেই আবার কান্না শুরু করে দিল।

এত ঘুটঘুটে অন্ধকারেও সে বুঝতে পারলো, গতকাল যে মেয়েকে সে আলোর সামনে দেখেছিল, এই সে মেয়ে। মেহেদী আল হাসান এ শব্দ আগেও কয়েকবার শুনেছে। এখন মেয়েটি তার এত কাছে যে, হাত বাড়ালেই সে তাকে ধরতে পারবে। টেনশনে তার বুক জোরে জোরে লাফাতে লাগলো। মেয়েটি আবার সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য পা বাড়াল, ঠিক সেই সময় সুড়ংয়ের মুখে আলো জ্বলে উঠলো।

আলোটা জ্বলেই সঙ্গে সঙ্গে আবার নিভে গেল। মেহেদী আল হাসান দেয়াল থেকে আলগোছে তুলে আনল তার দেহ এবং চোখের পলকে আগন্তুকের পিছন থেকে জোরে তাকে জাপটে ধরলো।

মেয়েটি এতে মোটেও ভীত না হয়ে বলে উঠলো, 'ওরে হতভাগা, তুই কি এটাকে কৌতুক ভাবতে শুরু করেছিস?

ছেড়ে দে আমাকে। আমি তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছি না। আগে শিকার ধর। তোর শিকার এসে গেছে। আগে তাকে ঘায়েল করে নে। ছাড়, জলদি ছাড় বলছি।'

মেহেদী আল হাসান যে সন্দেহে জীবন বাজী রেখে তাকে ধরতে চেয়েছিল, সে সন্দেহ সত্যে পরিণত হলো। সে চিন্তা করেছিল, যদি সত্যিই প্রেতাত্মা হয়, তবে সে কখনও সামনে আসবে না। আর যদি তা না হয়, তবে তো একটা বড় ধরনের শিকার হাতে পাওয়া যাবে।

মেয়েটি ভেবেছিল, তার সঙ্গী ডিউটি ফেলে তার সঙ্গ পাওয়ার জন্য এভাবে জড়িয়ে ধরেছে। তাই সে প্রথমটায় এটাকে তেমন আমল দেয়নি। কিন্তু মেহেদী আল হাসানের কণ্ঠ কানে যেতেই তার সম্বিত ফিরে এল।

মেহেদী আল হাসান তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'যদি চিৎকার দাও, তবে খঞ্জরের আঘাতে তোমাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলবো।'

'আমি তোমার কলিজা টেনে বের করে খেয়ে ফেলবো।' মেয়েটি বললো, 'জানো আমি কি?'

মেহেদী আল হাসান তাকে এক হাতে চেপে ধরে অন্য হাতে খঞ্জর বের করে তার ধারালো মাথা মেয়েটির পাঁজড়ে ঠেকাল। বলল, 'প্রাণের মায়া থাকলে আমি যা বলি মন দিয়ে শোন।'

এ সময় সুড়ংয়ের মুখে আর একবার আলো জ্বলে উঠলো। মেহেদী আল হাসান এ পথে বাইরে বের হওয়া বিপদজনক মনে করল। মেয়েটি ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে, কি ঘটেছে। সে

তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলে উঠল, 'আমি এ জন্যই তোমাকে কাল কাছে আসতে দেইনি। তোমরা দুনিয়ার মানুষরা বড় প্রতারক, বড় ফেরেববাজ। তোমাদেরকে বিশ্বাস করা যায় না।' মেয়েটি রাগত স্বরে বললো, 'দুই হাজার বছর ধরে এ জন্যই কি আমি তোমার পথ চেয়ে অপেক্ষা করছি, তুমি আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করবে?'

'হ্যাঁ, তোমার অপেক্ষার দিন শেষ হয়ে গেছে।' মেহেদী আল হাসান বললো, 'এখন আর তুমি আত্মার পবিত্র জগতে ফিরে যেতে পারবে না। এখন তুমি আমাদের এই অপবিত্র পৃথিবীর অপবিত্র মেয়ে ও নারী।'

'আমি নারী নই!' সে বললো, 'আমি নব-যৌবনা মেয়ে, খুব সুন্দরী মেয়ে।' সে কণ্ঠ নামিয়ে বলল, 'আমি জোরে কথা বলবো না, আমার কথা মনোযোগ সহকারে শুনে নাও। আমি জানি তুমি কে, আর কেন এখানে এসেছো। তুমি আমার কাছে এত বেশী পছন্দনীয় যে, তোমাকে পাওয়ার জন্যই আমাকে এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়েছে।'

'তবে আর আপত্তি কেন, আমার সঙ্গেই চলো।' মেহেদী আল হাসান বললো।

'না!' মেয়েটি বললো, 'বরং তুমিই আমার সঙ্গে চলো। যদি আমি তোমার সাথে যাই তবে আমরা দু'জনই না খেয়ে মরবো। যদি তুমি আমার সঙ্গে আসো, তবে ফেরাউনের সমস্ত গুপ্তধন আমাদের হবে। তোমাকে আর জঙ্গল, পাহাড় ও বিরাণ মরুভূমিতে ছুটে বেড়াতে হবে না। সামান্য বেতনের বিনিময়ে আর গোয়েন্দাগিরী করতে হবে না।'

'তোমরা এখানে কি করছো?' মেহেদী জিজ্ঞেস করলো।
'আমরা ফেরাউনের ধন-রত্ন বের করছি।' মেয়েটি বললো, 'আমি অনেক লোকের সঙ্গে এখানে আছি।'
'তারা সব কোথায়?' মেহেদী জিজ্ঞেস করলো।
'আমার সঙ্গে চলো, দেখতে পাবে। সকলেই তোমাকে খুশিতে বরণ করে নেবে।' মেয়েটি বললো, 'তুমি আমাকে যখন আলোতে দেখতে পাবে, তখন তুমি তোমার দুনিয়ার কথা, তোমার বিত্ত বৈভবের কথা সব ভুলে যাবে।'
মেহেদী আল হাসান মেয়েটির শরীর থেকে এক ধরনের সুগন্ধ পাচ্ছিল। তাতে সে নেশার ঘোর অনুভব করল। সে যখন মেয়েটিকে তার বাহুতে চেপে ধরেছিল, তখনই সে বুঝতে পারল, এই দেহ মানুষের ঈমান নষ্ট করার এক লোভনীয় বস্তু। মেয়েটির মিষ্টি মধুর কণ্ঠস্বরে যে সুধা লুকিয়ে আছে তার মোহ যে কোন পুরুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য যথেষ্ট। তার মাদকতাময় দেহ, নেশা জাগানো ঘ্রাণ সবই বিভ্রান্তির হাতিয়ার।
সেই মুহূর্তেই সুড়ংয়ের মুখে আবার আলো জ্বলে উঠলো। মেহেদী আল হাসান এবার সতর্ক হয়ে গেল। সে মেয়েটিকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করলো না। তার লোকেরা যে সুড়ংয়ের মুখে ও আশেপাশে আছে তা এই আলোই প্রমাণ করে দিল। সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, এদিকের মুখ দিয়ে সে বের হবে না। কারণ এদিকে মেয়েটির লোকজন অপেক্ষা করছে। সে অন্য পাশ দিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ার তাড়া অনুভব করল।

তখনি তার মনে হল, সেখানেও কি মেয়েটির লোকজন থাকতে পারে না? মেয়েটির সঙ্গী সাথী কয়জন ও কারা কিছুই তার জানা নেই। এ অবস্থায় অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া ছাড়া উপায় কি! সে মেয়েটিকে কর্কশ কণ্ঠে হুকুম করল, 'তোমার এ কাফনের পোষাক খুলে ফেলো।'

মেয়েটি হুকুম তামিল করল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার গায়ের ওপর জড়িয়ে রাখা সাদা কাপড়ের চাদরটি খুলে ফেললো। মেহেদী আল হাসান চাদরটি এক টানে ছিঁড়ে তার এক টুকরো দিয়ে মেয়েটির হাত পিছনে নিয়ে বেঁধে ফেললো। অপর টুকরো দিয়ে তার পা দু'টিও বেঁধে ফেললো। তৃতীয় আরেকটি খণ্ড দিয়ে মুখটিও বেঁধে দিল। তারপর তাকে কাঁধে উঠিয়ে গুহা থেকে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।

খঞ্জরটি তার হাতেই ছিল। সে সুড়ংয়ের মুখ পিছনে রেখে মেয়েটিকে নিয়ে ছুটতে লাগলো। উদ্দেশ্য, পেছনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে এখান থেকে সরে পড়া। দ্রুত পালাতে না পারলে মেয়েটির সঙ্গী সাথীরা তাকে ধরে ফেলবে। আর তাদের হাতে একবার ধরা পড়ার মানে হচ্ছে, আগে যে দুই কমাণ্ডার এখানে মারা পড়েছে তাদের ভাগ্য বরণ করা। কিন্তু না, এভাবে মৃত্যুর কাছে নিজেকে সঁপে দেয়ার কোন মানে হয় না। সে প্রাণপণে ছুটতে লাগল।

০

গত রাতে যখন মেহেদী আল হাসান এখানে এসেছিল তখন প্রেতাত্মার সাথেই সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। সুড়ংয়ের মাঝে

আলোর ঝিলিকের ভেতর পলকের জন্য সে তাকে দেখতেও পেয়েছিল। পরে সেই নারী অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

মেহেদী যখন সুড়ং পথে দাঁড়িয়ে ছিল তখন সুড়ংয়ের বাইরে সে আলো দেখতে পেয়েছিল। সে সুড়ংয়ের ভেতর দিয়ে ওপাশে যাওয়ার সময় পলকের জন্য একটি ছায়াও দেখেছিল। দিনের বেলা সুড়ংয়ের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করার সময় সে এক টুকরা ফিতা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখল। ফিতাটি দেখেই সে বুঝে নিয়েছিল, এটা মৃতের কাফন বাঁধার ফিতা। আলী বিন সুফিয়ানের কাছে সে গোয়েন্দাগিরীর ট্রেনিং পেয়েছে। সামান্য জিনিসও যে অনেক সময় বড় রহস্য উদঘাটন করে ফেলে সে শিক্ষা সে আলী বিন সুফিয়ানের কাছেই পেয়েছিল। ফলে এই সামান্য ফিতা তার কাছে অনেক বড় হয়ে দেখা দিল। তার মনে সন্দেহ সৃষ্টি করল এই ফিতা। তাই আজ রাতে প্রেতাত্মার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসার সময় হেকিমের নিষেধ সত্ত্বেও সঙ্গে খঞ্জর নিয়ে এসেছিল। এটা পরীক্ষার এক সুন্দর পদ্ধতি। খঞ্জর থাকা সত্ত্বেও প্রেতাত্মা এসে হাজির হয়েছে। অতএব হেকিমের বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

তাই আজ তার সাহসিকতা প্রদর্শনের দিন। আলো দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৌশলে সুড়ংয়ের ভেতর প্রবেশ করার সময়ই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল, আজ সে প্রেতাত্মার মুখোমুখি হবে।

এই আগুন ও প্রেতাত্মার কাহিনী মেহেদী আল হাসানের মনে অতীতের কিছু ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তার মনে

পড়ে গেল, ক্রুসেডাররা ঠিক এমনিভাবে মিশরের পাহাড়ী এলাকার মূর্খ লোকদের ধোঁকা দেয়ার জন্য চেষ্টা করেছিল। তারা পাহাড়ের ওপর বড় ধরনের মশাল জ্বালিয়ে তার সামনে কাঠের তক্তা রাখতো, যাতে আলোর উৎস গোপন থাকে।

এরপর তারা চমকপ্রদ ধাতুর পাত ব্যবহার করতো। চকমকি ধাতুর চমক ও আলোর কিরণ সামনের পাহাড়ে গিয়ে পড়তো। মশাল ও চকমকি ধাতুর মাঝখানে অন্য আরেকটি কাঠের তক্তা রাখা হতো। সেটি খাঁড়া করলে জ্যোতি নিভে যেত আর শুইয়ে দিলে আলোর চমক সৃষ্টি হতো। এই মশাল ও চকমকি ধাতুর পাত এমন ভাবে রাখা হতো, যা সহজে লোকদের চোখে পড়ত না।

কিন্তু মিশরে আইয়ুবীর গোয়েন্দাদের হাতে ক্রুসেডারদের এই কেরামতি ধরা পড়ে যায়। তখন তারা সেই পাহাড়ী লোকদের কাছে সব ফাঁস করে দেয়। নইলে সহজ সরল পাহাড়ী লোকেরা ব্যাপারটিকে অলৌকিক ব্যাপার বলেই বিশ্বাস করতো। এই রহস্য উদঘাটন অভিযানে সৌভাগ্যক্রমে মেহেদী আল হাসানও জড়িত ছিল। তাই সে বুঝতে পারল, সুড়ংয়ের ভেতর আলোর নাচন কোন অলৌকিক ব্যাপার নয়, এটা মানুষকে বিভ্রান্ত করার একটি অপকৌশল মাত্র।

এটা যে ক্রুসেডারদের অপকৌশল তা বুঝতে পেরেছিল বলেই সে মেয়েটিকে আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি। জিজ্ঞেস করার মত হাতে সময়ই বা কোথায়? যে কোন সময় মেয়েটির সঙ্গীরা এসে পড়তে পারে। তখন মেয়েটিকে তো তারা ছিনিয়ে নেবেই, তার নিজের জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই

মেয়েটিকে আর কিছু জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন মনে করেনি সে। জিজ্ঞেস করলে ভুল ব্যাখ্যা ও বুঝ দিয়ে তাকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাওয়া ছাড়া মেয়েটি আর কিইবা করতে পারতো!

মেহেদী আল হাসান মেয়েটিকে কাঁধে নিয়ে উল্টো পথে প্রাণপণে ছুটছিল। আলো নিক্ষেপকারীরা সুড়ং মুখে আরও কয়েকবার আলো ফেললো। কিন্তু তখন মেহেদী আল হাসান মেয়েটাকে নিয়ে ছুটছে। মেয়েটির কান্নার আওয়াজ থেমে গিয়েছিল। এটা ছিল এক ধরনের সংকেত ধ্বনি। অর্থাৎ শিকার এখনো জালে ধরা পড়েনি। কিন্তু তার কান্নার আওয়াজ থেমে যেতেই মেহেদী আল হাসানকে একটি ভয় এসে তাড়া করল। সে ভেবে দেখল, মেয়েটির কান্না থেমে যাওয়ায় তার লোকজন ভাববে, শিকার জালে পড়েছে। তখন তাকে ধরার জন্য তারা ছুটে আসবে। কিন্তু যেখানে মেয়েটিকে পাওয়ার কথা সেখানে না পেলে তারা চারদিক ছড়িয়ে পড়বে তার তালাশে। আবার এমনও হতে পারে, মেয়েটির কোন সাড়া না পেয়ে তার কি হয়েছে দেখার জন্য ওরা সুড়ংয়ের ভেতর নেমে আসতে পারে।

সে মেয়েটাকে কাঁধে নিয়ে গুহার অপর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। সুড়ংয়ের মুখ থেকে কিছু দূরে গিয়ে সে মেয়েটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটিতে বসিয়ে দিল। তারপর তার মুখের বাঁধন খুলে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি আমাকে বলবে, আমি কোন দিক দিয়ে গেলে তোমাদের লোকদের সামনে পড়বো না?'

'যদি তুমি একা যাও তবে বলতে পারি।'

'তুমি আমার সঙ্গেই যাবে।' মেহেদী আল হাসান বললো, 'দেখো, আমাকে যদি ফাঁসাতে চেষ্টা করো, তবে আমি তো শেষ হবোই, তোমাকেও জীবিত রাখবো না।'

'আমি তোমাকে সেই গোপন তথ্য বলে দেব, যে গোপন ভেদ জানার জন্য তুমি আগ্রহী, যদি তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।'

'কোন শর্ত ছাড়াই আমি যা জানতে চাই তা যদি আমাকে না বলো তাহলে আমাকে সেই পথ ধরতে হবে, যা আমার পছন্দ নয়।'

'তুমি আমাকে শুধু একবার আলোতে দেখে নাও।' মেয়েটি বললো, 'আর আমাকে তোমার নিজের মনে করে একবার আমার সাথে চলো; আমি তোমার সাথে কোন প্রতারণা করছি না।'

মেয়েটি মেহেদী আল হাসানকে তার রূপ যৌবন দিয়ে প্রলোভিত করার চেষ্টা করল। তাতেও সুবিধা করতে না পেরে ধন-রত্নের লোভ দেখাল। কিন্তু তাকে কাবু করতে পারল না। মেহেদী আল হাসান মেয়েটিকে আর কথা বাড়াবার সুযোগ না দিয়ে আবার তার মুখ বেঁধে দিল। তারপর নিজের বুদ্ধিমত একটা নিরাপদ রাস্তা বেছে নিল। রাস্তাটি পাহাড়ের উপর দিয়ে এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেছে।

সে মেয়েটাকে সেখানেই বসিয়ে রেখে উপরে উঠতে লাগলো। পাহাড়ী লতাপাতা, গাছের ডালের ফাঁক-ফোঁকড় গলে সে মাত্র কয়েক কদম এগিয়েছে, মেয়েটিকে ডাকতে ডাকতে একটি লোক নিচে থেকে উপরে উঠতে শুরু করল। মেহেদী আল হাসান উপরে ওঠা বন্ধ করে ধীরে ধীরে নিচে নামলো

এবং মেয়েটির কাছাকাছি এসে এক পাথরের আড়ালে লুকাল।
লোকটি সম্ভবত মেয়েটাকে দেখতে পেয়েছিল। কারণ সে ছিল উন্মুক্ত জায়গায়। লোকটি বলে উঠল, 'তুমি কথা বলছো না কেন?'
লোকটি প্রশ্ন করছে আর উপরে উঠছে। মেয়েটির মুখ বাঁধা ছিল, তাই সে লোকটির কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারছিল না। অবশেষে লোকটি তার একদম কাছে এসে বসে পড়ল আর বললো, 'তোমার কি হয়েছে? ওদিকে গেলে না?'
মেহেদী আল হাসান তার পিছনেই ছিল। মাত্র দু'তিন গজ দূরে। সে দ্রুতবেগে উঠে লোকটির পিঠে সজোরে খঞ্জর বসিয়ে দিল। লোকটি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতেই সে খঞ্জর টেনে নিয়ে আবার সজোরে আঘাত করল।
এই দুই আঘাতেই লোকটির ভবলীলা সাঙ্গ হল, সে আর কোন শব্দই করতে পারল না।
মেহেদী আল হাসান তাকে টেনে নিয়ে সেই পাথরের আড়ালে ফেলে দিল। এরপর সে মেয়েটাকে আবার কাঁধে উঠিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগলো।
পাহাড়টা তেমন উঁচু ছিল না। উপরের দিকটা ছিল বেশ চওড়া। মেহেদী আল হাসান সেই উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছল। মেয়েটিকে নিয়ে এতটা চড়াই মাড়িয়ে সে একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছিল। তার সারা শরীর দিয়ে সমানে ঘাম ঝরছিল। পানির পিপাসায় মুখ শুকিয়ে এসেছিল। উপত্যকায় পৌঁছে সে থামল। মেয়েটিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে

পড়ে লম্বা লম্বা শ্বাস নিতে লাগল।
তার জন্য সবচে ভাল হতো যদি বাকী রাতটুকু কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারতো। তারপর দিনের আলোয় একদিকে সরে পড়া তেমন সমস্যা হতো না। কিন্তু এ ঝুঁকি নেয়ার সাহস তার হলো না। সে তাড়াতাড়ি কায়রো পৌঁছতে চাচ্ছিল, যাতেহেকিমকে গ্রেফতার করতে পারে এবং ভোর হওয়ার আগেই এই এলাকাও অবরোধ করে নিতে পারে।
সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলো। নিচে যেখানে মশালের আলো জ্বলছিল সেখানে এক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। লোকটা আয়নার মত স্বচ্ছ নিকেল করা ধাতুর পাত দুই হাতে উঠিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরাচ্ছিল। লোকটার পাশে মনে হয় আরও একজন আছে। অন্ধকারের কারণে তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।
মেহেদী আল হাসান পাহাড়ের উপরে থাকায় তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছিল না। আর অপেক্ষা করা সমীচিন মনে করল না মেহেদী। সে মেয়েটিকে কাঁধে উঠিয়ে ধীরে ধীরে পাহাড়ের অপর পাশ দিয়ে নিচে নামতে শুরু করল।

০

এই পাহাড়ী অঞ্চলের গভীর অরণ্যে যেখানে কখনো কোন পথিক বা রাখাল যায় না, তেমন একটি জায়গায় একটি ছোট্ট পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে পর্বত গহ্বরের একটি খোলা মুখ। এই মুখ দিয়ে গহ্বরের ভেতরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে

প্রশস্ত জায়গা। এটি কোন পর্বত গহ্বর নয়, এটি একটি বিশাল কামরা।
সেই কামরায় অনেকগুলো লোক বসেছিল। এদের মধ্যে দু'টি মেয়েও ছিল। তাদের একজন বলল, 'এতক্ষণে তো ওদের ফিরে আসার কথা।' তার কথার মধ্যে দুশ্চিন্তার ছাপ ছিল।
'অবশ্যই আসবে!' অন্য মেয়েটি বললো, 'ওখানে তো ভয় বা বিপদের কিছু নেই। আজ শিকার নিয়ে আসবে তো, তাই হয়তো একটু দেরী হচ্ছে।'
'এ শিকারটা খুব কাজের লোক!' আর একজন বললো, 'হতভাগা বড় দক্ষ গোয়েন্দা। আমরা তাকে নিজের মত করে গড়ে নেব।'
সেই মুহূর্তেই একটা লোক দৌড়ে ভেতরে এলো এবং বললো, 'গোপাল মরে পড়ে আছে, সিনথিয়ার কোন খোঁজ নেই। সে কি এদিকে এসেছে?'
'না!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল একজন, 'গোপাল কিভাবে নিহত হলো?'
'গোপালকে খঞ্জর দিয়ে খুন করা হয়েছে।'
'সেই লোকটি অর্থাৎ মেহেদী আল হাসান কোথায়?' অন্য একজন জিজ্ঞেস করলো।
'কোথাও তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।' লোকটি উত্তর দিল, 'তার উটটি ওখানেই আছে। কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'
'কি বেকুবের মত কথা বলছো! উট যদি ওখানেই থাকে তাহলে সেও ওখানেই আছে। হয়তো কোন গর্তে বা ঝোপের

আড়ালে লুকিয়ে আছে। ভাল মত খোঁজ করো, পেয়ে যাবে।'
'ভাল মতই তো খুঁজেছি। গুহার বাইরে থেকে কয়েকবার সংকেত দেয়ার পরও সিনথিয়ার কোন সাড়া না পেয়ে দু'টি মশাল নিয়ে আমরা সুড়ংয়ে ঢুকেছিলাম। সেখানে কাউকে না পেয়ে উল্টো পাশের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আমরা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে খুঁজতে লাগলাম। ঘুরতে ঘুরতে সুড়ং মুখের সামান্য উপরে আমরা গোপালের লাশ পেলাম। সেও আমাদের সাথেই সুড়ং থেকে বেরিয়েছিল এবং সিনথিয়াকে ডাকতে ডাকতে ওদিকে গিয়েছিল।'
'সুড়ংয়ের ভেতরে গিয়ে তোমরা কি দেখলে?'
'সেখানে মেয়েটার কাপড়ের একটা টুকরা শুধু পড়েছিল, আর কিছু পাইনি।'
দলনেতা বুঝতে পারল, অবস্থা গুরুতর। সে সকলকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'পরিস্থিতি আমার ভাল ঠেকছে না। তোমরা দু'জন আস্তানার বাইরে ডিউটিতে চলে যাও।' সে দু'জনের দিকে ইশারা করে বলল, 'যদি বাইরে থেকে কোন বিপদ আসে, তবে সংবাদ জানাবে।' এরপর আর দু'জনের দিকে ইশারা করে বলল, 'আর তোমরা দু'জন সেই পাহাড়ের পথ ধরো। যদি তাদের খোঁজ পাও, ধরে নিয়ে আসবে। আর যদি সে তোমাদের সাথে লড়াই করে তবে হত্যা করবে। অন্য যারা আছো তারা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাও। একভাগ এখানেই অপেক্ষা করবে যে কোন জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য, বাকীরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ো। সে এই পাহাড়ী অঞ্চলেই কোথাও লুকিয়ে আছে। যদি সকাল পর্যন্ত

না পাওয়া যায়, তবে দিনের আলোতে তাকে অবশ্যই ধরা দিতে হবে।'

মেহেদী আল হাসান তখন মেয়েটিকে কাঁধে নিয়ে ছুটছে কায়রোর দিকে। পাহাড় থেকে নেমে সে উটের কাছে যাওয়ার ঝুঁকি নিল না। কারণ ইতিমধ্যেই সে যে তাদের ফাঁদে পা দেয়নি তা জানাজানি হয়ে যাওয়ার কথা। ফলে তাকে ধরার জন্য এই কুচক্রী মহল চেষ্টার কোন ত্রুটি করবে না।

এ কথা ভেবেই সে কায়রো যাবার সহজ রাস্তা ছেড়ে দুর্গম পার্বত্য পথ ধরল। চলতে চলতে এক জায়গায় গিয়ে সে মহা সমস্যায় পড়ে গেল।

ততক্ষণে সে সুড়ংওয়ালা পাহাড় থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়, এইভাবে চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সে এক দুর্গম পাহাড়ে উঠে গেল।

এখানে কোন রাস্তা ছিল না যে, সে ওই রাস্তা ধরে এগুবে। সে তার আন্দাজ মত কায়রো অভিমুখে ছুটছিল। কিছু দূর যাওয়ার পর দেখতে পেল সামনে পথ বন্ধ।

সে ডানে বামে তাকিয়ে দেখল। পাহাড়ের ডানে বামে কোথাও কোন ঢাল নেই, যেখান দিয়ে পরবর্তী পাহাড়ে যাওয়া যায়। পাহাড়ের চূড়ায় প্রায় বিশ গজের মত জায়গা আছে, যা একটা দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে আছে। এটা পেরোলে আবার হাঁটা চলার উপযোগী পাহাড় পাওয়া যাবে। এই বিশ গজের দেয়ালটা খাঁড়া এবং বেশ উঁচু, প্রস্থে কোথাও এক ফুট, কোথাও তারও কিছু কম।

পাহাড়ের এই খাড়া ও উঁচু চূড়াটা মেহেদী আল হাসানের জন্য

মস্ত বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। এর ওপর এক সঙ্গে দু'টি পা রাখাও সম্ভব নয়। সে এই দুর্গম দেয়াল দেখে সেখানেই থেমে গেল এবং সিনথিয়াকে নামিয়ে ভাবতে বসল। কিন্তু ভাবাভাবির বেশী সময় ছিল না। পেছন থেকে যে কোন সময় দুশমন চলে আসতে পারে। তাই সে সিনথিয়াকে আবার কাঁধে তুলে নিয়ে সেই দেয়ালের ওপর চড়ে বসল। যেভাবে ঘোড়ায় চড়ে সেভাবে দেয়ালের দু'পাশে পা ঝুলিয়ে বসে হেঁচড়ে হেঁচড়ে সে সামনে বাড়তে থাকল।

মেয়েটাকে কাঁধে নিয়ে এমনিতেই ওজনের ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। তার ওপর মেয়েটা শুরু করল শয়তানী। তাকে ফেলে দেয়ার জন্য কাঁধের উপর ভীষণ নড়াচড়া করতে লাগলো। সেখান থেকে পড়লে হাড়-মাংস এক হয়ে যাবে, এ কথা মেয়েটাও বুঝতে পারছিল। কিন্তু গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করার চেয়ে জীবন দেয়া শ্রেয় মনে করে মেয়েটা এমন ছটফট করছিল। মেহেদী আল হাসানও বুঝতে পারল, এখান থেকে পড়লে মেয়েটির সাথে সে নিজেও শেষ হয়ে যাবে।

মেহেদী আল হাসান মহা সমস্যায় পড়ে গেল। মেয়েটি এমন দুষ্টামী করলে এ দেয়াল আদৌ পার হওয়া যাবে কিনা তাই সন্দেহ। এদিকে মেয়েটিকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে থামছে না। ওদিকে মেয়েটির লোকজন নিশ্চয়ই তার সন্ধানে এতক্ষণে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দেয়াল পার হওয়াটা মেহেদী আল হাসানের জন্য জীবন মরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। দুষ্কৃতকারীদের হাতে ধরা পড়ার অর্থ নির্মম ও যন্ত্রণাদায়ক

মৃত্যু। কিন্তু এ নিয়ে তার বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল না। সে ভাবছিল, এর ফলে জাতির অবর্ণনীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। সে এই ক্ষতি হতে দিতে পারে না। সে মেয়েটির দু'টি বাহু বগলের নিচে নিয়ে এমন জোরে চেপে ধরলো, মেয়েটির বাহু ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হলো। মেয়েটি বেদনায় গুঙিয়ে উঠল। সে বলল, 'সাবধান, আবার নড়াচড়া করলে তোমার বাহু দু'টি ভেঙে ফেলতে বাধ্য হবো।'

এটুকু ঔষধেই কাজ হলো। কিছুটা শান্ত হলো মেয়েটি। মেহেদী আল হাসান তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে অতি সাবধানে বুকে ভর করে সামনে এগুতে লাগল। এক সময় তার এ প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা শেষ হলো। তার শক্তি ও সাহস ওই পাহাড়ী দেয়াল তাকে পার করে নিয়ে এল।

সামনে মোটামুটি প্রশস্ত এক উপত্যকা। মেহেদী আল হাসান সেখানে পৌঁছেই মেয়েটিকে ধপাস করে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর তার দিকে তাকিয়ে ভীষণ রাগের সাথে বললো, 'তুমি কি আমার রাস্তা বন্ধ করতে পারবে?'

সে মেয়েটাকে রাগের মাথায় দু'চার কদম টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে গেল আর বললো, 'যদি আমার পথে আর কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করো, তবে এমন ভাবে সারা রাস্তা আমি তোমাকে টেনে নিয়ে যাবো। যদি মরার ইচ্ছা থাকে তো মরো।'

এ সময় সে দূরে নিচে একটি মশাল দেখতে পেল। সে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে বুঝতে পারলো, সে বিপদ পার হয়ে এসেছে। কারণ মশালটি সেই ভয়ংকর দেয়ালের ওপাশে। কিন্তু এতে তার উৎফুল্ল হওয়ার কিছু নেই। তাকে জলদি

কায়রো পৌঁছতে হবে।

সে মেয়েটার পায়ের বাঁধন খুলে দিল। হাত পিছনে পিঠের সাথে আগের মতই বাঁধা থাকল। পায়ের বাঁধন খুলে সে মেয়েটার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। খঞ্জরের ধারালো মাথা মেয়েটির গায়ে ঠেকিয়ে বললো, 'সামনে বাড়ো। আমার হুকুম ছাড়া ডানে বায়ে ঘুরবে না।'

তাদের অনুসন্ধানে পিছু নিয়ে যে ব্যক্তি বের হয়েছিল, সে সুড়ংয়ের মধ্যে ও আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল। সিনথিয়া ও মেহেদী আল হাসানকে কোথাও না পেয়ে সে সুড়ংয়ের মুখে দাঁড়ানো দু'জনকে ডেকে বললো, 'ওদের তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।'

মেহেদী আল হাসান যেখান থেকে সুড়ংয়ের মধ্যে প্রবেশ করেছিল লোক দু'জন সেখানে এসে দাঁড়ালো।

মেহেদী আল হাসান ততক্ষণে বিপদজনক দেয়াল পার হয়ে একটি সমতল উপত্যকায় এসে পৌঁছলো। সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে তারা আবার একটি দুর্গম পাহাড়ের সামনে পড়ল। এ পাহাড় খাঁড়া এবং এত উঁচু ছিল যে, সেখানে চড়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

মেহেদী আল হাসান ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দা। বিপদ-বাঁধা তুচ্ছ করে এগিয়ে চলাই তার কাজ। অন্ধকারেও জায়গাটা চিনে ফেলল সে।

সে সামনে তাকিয়ে বুঝল, এ পাহাড় অতিক্রম করা সম্ভব নয়। তারচে ডানে বা বায়ে কেটে এগিয়ে যেতে হবে। এ

পাহাড়টার ওপাশেই আছে নীলনদ। নীলনদের পাড় ঘেঁষে একটি রাস্তা সোজা কায়রোর দিকে এগিয়ে গেছে। তাকে এখন সে রাস্তাতেই গিয়ে উঠতে হবে।

সে এবার মেয়েটির হাত এবং মুখের বাঁধনও খুলে দিল। তারপর তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এল পাহাড়ের ঢালে। বললো, 'বসে পড়ো এবং নিজেকে নিচের দিকে গড়িয়ে দাও।'

দু'জনেই পাহাড়ের গা ঘেঁষে গড়িয়ে নিচে নেমে এল। তারা পাহাড়ী ঢালের নিচে এসে পৌছতেই পানির কুল কুল শব্দ শুনতে পেল। নদীর উঁচু পাড়ে এসে দাঁড়াল তারা। মেহেদী আল হাসানের মনে পড়ে গেল, তাকে এবং মেয়েটিকে তার সাথীরা খুঁজছে। এ অবস্থায় সোজা রাস্তায় কায়রো রওনা দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সঙ্গে সঙ্গে সে নতুন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। মেয়েটিকে আদেশ করলো, 'নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ো!'

মেয়েটি বললো, 'আমি সাঁতার জানি না।'

মেহেদী আল হাসান খঞ্জরটি খাপের মধ্যে পুরে নিয়ে মেয়েটিকে শক্ত করে চেপে ধরে নদীতে ঝাঁপ দিল। নদীর ভাটির টান ছিল কায়রোর দিকে। সে মেয়েটিকে তার বুদ্ধির উপরে ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো। দেখলো, মেয়েটি বেশ সাঁতার কাটছে।

'আমার ধারণা ছিল তুমি সাঁতার দিতে পারবে।' মেহেদী বললো, 'আমি জানি তোমাকে সব ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়েই আমাদের দেশে পাঠানো হয়েছে। বেশী শক্তি প্রয়োগ করার দরকার নেই। কেবল গা ভাসিয়ে রাখো, দেখবে নদীর স্রোতই তোমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। স্রোত এখন আমাদের

অনুকূলে। কারণ আমরাও ভাটির দিকেই যাবো।'

তাদের দুই পাশেই পাহাড় ও উপত্যকা। এক পাশে তাদের অনুসন্ধানে পাহাড় জঙ্গল চষে ফিরছে একদল দুষ্কৃতকারী। অন্য পাশে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে নিরেট পাহাড়।

সাঁতরাতে সাঁতরাতে মেয়েটি আরেকবার চেষ্টা করলো মেহেদী আল হাসানকে তার রূপ ও যৌবনের ফাঁদে আটকাতে। কিন্তু ব্যর্থ হলো তার চেষ্টা।

নদী পথে সাঁতরে অনেক দূর চলে এসেছে তারা। মেহেদী আল হাসান দেখলো, তারা বিপদসীমা পার হয়ে এসেছে। সে মুখে আঙ্গুল দিয়ে বিশেষ ধরনের সিটি বাজাতে লাগলো।

সে স্বাভাবিক গতিতে সাঁতার কাটছিল আর মাঝে মাঝে সিটি বাজাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরই সে অনুরূপ সিটি বাজানো শুনতে পেলো। কয়েকবার সিটি বিনিময়ের পর একটি টহল নৌকা তাদের কাছে এসে থামল।

মেহেদী আল হাসান ভাল মতই জানতো, যেভাবে সীমান্তের প্রহরীরা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা পাহারায় থাকে তেমনি নদীতেও চব্বিশ ঘন্টা পাহারার ব্যবস্থা থাকে। নদীতে কোন নৌসেনা বিপদে পড়লে একে অপরকে এভাবেই বিপদ সংকেত দেয়, যেমনটি দিয়েছে মেহেদী আল হাসান। সংকেত পেয়েই নৌ প্রহরী ছুটে এসেছে তাদের কাছে। মেহেদী আল হাসান নিজের পরিচয় দিল ওদের কাছে। প্রহরীরা তাকে এবং মেয়েটিকে নৌকায় উঠিয়ে নিল।

০

আলী বিন সুফিয়ান গভীর নিদ্রায় ডুবেছিলেন। তাঁকে তাঁর চাকর জাগিয়ে দিয়ে বললো, 'মেহেদী আল হাসান এই মুহূর্তে আপনার সাথে দেখা করতে চায়। তার সাথে একটি মেয়েও আছে।'

মেহেদী আল হাসান নামটাই তার কাছে যথেষ্ট ছিল। আলী বিন সুফিয়ান দ্রুত বিছানা ত্যাগ করলেন এবং তড়িঘড়ি বাইরে ছুটে গেলেন। তখনও মেহেদী আল হাসান এবং মেয়েটির কাপড় থেকে পানি ঝরছিল।

দু'জনকেই তার কামরায় নিয়ে গিয়ে বসতে বললেন আলী বিন সুফিয়ান। কামরায় প্রদীপ জ্বলছে। মেহেদী আল হাসান এই প্রথম প্রদীপের আলোয় মেয়েটিকে দেখতে পেলো। সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মনে মনে স্বীকার করলো, মেয়েটি ঠিকই বলেছিল, 'যদি তুমি পুরুষ মানুষ হও আর আমাকে কখনও আলোতে দেখতে পাও, তবে আমি হলফ করে বলতে পারি, তুমি তোমার কর্তব্যের কথা ভুলে যাবে।'

মেহেদী আল হাসান হেকিমের নাম উচ্চারণ করে বললো, 'তার ঘরে এক্ষুণি তল্লাশী চালাতে হবে। সব কথা আমি আপনাকে খুলে বলছি, আগে তাকে গ্রেফতারের ব্যবস্থা করুন।'

'মেহেদী!' আলী বিন সুফিয়ান বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কার নাম বলছো, বুঝতে পারছো?'

'বেয়াদবী মাফ করবেন, বিশ্বাসঘাতক কখনো পরের ঘরে থাকে না। আর চাইলেও সবাই বিশ্বাসঘাতক হতে পারে না।

শক্ত পোক্ত আচ্ছাদন না থাকলে বিশ্বাসঘাতকতা করাও যায় না। নামী দামী লোকের বিশ্বাসঘাতক হওয়া কি কোন নতুন সংবাদ?'

আলী বিন সুফিয়ান মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হেকিম সাহেব কি তোমাদের দলেরই লোক? এখানে মিথ্যা বললে কিন্তু পরিণাম ভয়াবহ হবে। অতএব বুঝে শুনে ভেবে উত্তর দাও।'

মেয়েটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। আলী বিন সুফিয়ান মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখানে তোমাদের সাথে সে রকম কোন ব্যবহার করা হবে না, যেমনটি তুমি ভয় পাচ্ছো। তোমার সৌন্দর্য এবং রূপ যৌবনের মোকাবেলায় আমার সৈনিকরা পাথরের মত মজবুত। কিন্তু অসহায় মেয়েদের সাহায্যের বেলায় আমরা রেশমের মত কোমল ও মোমের মত নরম। তুমি নির্ভয়ে আবার বলো, হেকিম কি আসলেই তোমাদের সাথী?'

সিনথিয়া মাথা নত রেখেই সংক্ষেপে বললো, 'হ্যাঁ।'

মেহেদী আল হাসান সংক্ষেপে আলী বিন সুফিয়ানের কাছে তার কাহিনী বর্ণনা করলো। হেকিম কি করে তাকে প্রেতাত্মার ভয় দেখিয়েছিল তাও খুলে বলল।

আলী বিন সুফিয়ান সঙ্গে সঙ্গে কমাণ্ডো বাহিনীর কমাণ্ডারকে ডেকে পাঠালেন। কায়রোর পুলিশ প্রধান গিয়াস বিলকিসকেও ডাকলেন। তাকে হেকিমের বাড়ীতে অতর্কিতে অভিযান চালানোর হুকুম দিয়ে বললেন, 'হেকিমকে গ্রেফতার করে নিজের হেফাজতে নিয়ে নাও। তার বাড়ী ও দাওয়াখানায়

তল্লাশী অভিযান চালাও।'

তারপর তিনি কমাণ্ডো বাহিনীর কমাণ্ডারকে বললেন, 'জলদি বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হও। এখনি অভিযানে বেরোতে হবে।'

রাতের অন্ধকারেই একদল কমাণ্ডো সৈনিক দ্রুত ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এল। যে কোন ধরনের অভিযানের জন্য ওরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আদেশ পাওয়ার সাথে সাথেই ঐক্যবদ্ধ ভাবে দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে ওদের কোন জুড়ি নেই।

মেহেদী আল হাসানের রিপোর্ট অনুযায়ী সেই দুর্গম পাহাড়ে অভিযান চালানোর জন্য কমাণ্ডো বাহিনী দ্রুত তৈরী হয়ে এলে আলী বিন সুফিয়ান নিজে তাদের পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। গিয়াস বিলকিসকে তার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে তিনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। অন্য দু'টি ঘোড়ার একটিতে মেহেদী আল হাসান অপরটিতে মেয়েটিকে বসিয়ে রাতের অন্ধকারেই যাত্রা করলেন তিনি। ভোরের আলো ফোটার আগেই তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে যেতে চান।

কায়রো থেকে জায়গাটি বেশী দূরে ছিল না। মেয়েটির খোঁজে তার বাহিনীর লোকজন তখনো পাহাড়ের প্রতিটি খানাখন্দ ও ঝোপঝাড় চষে ফিরছিল। সর্বত্র তন্ন তন্ন করেও খুঁজে তাকে না পেয়ে ওরা অধীর ও হতাশ হয়ে পড়ল।

শেষ রাতে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে আস্তানায় ফিরে এল তারা। দলের কমাণ্ডার বলল, 'অবস্থা গুরুতর, নিশ্চয়ই এ কথা সবাই বুঝতে পারছো? সিনথিয়া এবং মেহেদীকে কোথাও না পাওয়ার মানে হচ্ছে, তারা কায়রো চলে গেছে। যদি তাই হয় তাহলে সে ফৌজ পাঠাতে দেরী করবে না। তাই অনতিবিলম্বে

আমাদেরকে এ স্থান ত্যাগ করতে হবে।'

কয়েকজন তার কথার প্রতিবাদ করল। বলল, 'তার উট এখানে রয়ে গেছে। পালালে সে নিশ্চয়ই তার উটটি নিয়েই পালাতো। একটা মেয়েকে নিয়ে এতদূর হেঁটে যাওয়ার মত বোকামী করার লোক সে নয়। তাছাড়া আমরা কায়রোর পথে একাধিক গ্রুপ পাঠিয়েছি। ওই পথে গেলে আমাদের গ্রুপের চোখে ওরা পড়তোই।'

কিন্তু এ যুক্তি মেনে নিতে পারল না কমাণ্ডার। আরো কয়েকজন কমাণ্ডারকে সমর্থন করে বলল, 'এখন এখানে বসে থাকাই বোকামী হবে।'

ফলে সিদ্ধান্ত হল, ওরা এ আস্তানা থেকে পালিয়ে যাবে। দলনেতা বলল, 'যদি সিনথিয়াকে মেহেদী কোনভাবে কায়রো নিয়ে যেতে পারে তবে তার কাছ থেকে ওরা সব তথ্য আদায় করে ছাড়বে। তাই ঝুঁকি এড়ানোর জন্য আমাদের দ্রুত সরে পড়ার চেষ্টা করতে হবে।'

সিনথিয়াকে খুঁজতে গিয়ে এমনিতেই ওরা অনেক সময় ব্যয় করে ফেলেছিল, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে রওনা করতে গিয়ে তাদের আরো দেরী হয়ে গেল।

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে ওরা যখন আস্তানা থেকে বেরোতে যাবে তখনি ওদের কানে এল ঘোড়ার সম্মিলিত পদধ্বনি। তারা আস্তানা থেকে বের হয়ে দেখলো, পালাবার সমস্ত পথ তাদের বন্ধ হয়ে গেছে।

আলী বিন সুফিয়ানের কমাণ্ডোরা মশাল জ্বালিয়ে এলাকাটা আলোকিত করে তুলল। সিনথিয়া তাদের সাথেই ছিল, সে

সব কথাই বললো ওদের। তার কাছ থেকেই জানা গেল দলের কে কোথায় আছে।

আস্তানাতেই পাওয়া গেল পাঁচ ছয় জন ক্রুসেডার। ভেতরে পাওয়া গেল বিভিন্ন আসবাবপত্র ও মালামালের স্তুপ। যার মধ্যে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ, তীর, ধনুক, খঞ্জর, তলোয়ার এবং লোহার সিন্দুকে প্রচুর সোনা-দানা ও মনি-মুক্তা। মিশরের প্রচলিত মুদ্রাও ছিল প্রচুর পরিমাণে।

ধৃত লোকদের মধ্যে মাত্র একজন বিদেশী ছিল, সেই ছিল দলের একমাত্র খৃস্টান। বাকি সবাই ছিল মিশরের মুসলমান। তাদের দ্বারাই অন্যান্য সঙ্গীদের ধরা ও অনুসন্ধান আরম্ভ হলো। সারা রাত এবং পরের দিনও অনুসন্ধান ও তল্লাশী কাজ চললো অব্যাহতভাবে। শেষ পর্যন্ত তাদের অবশিষ্টরাও ধরা পড়ে গেল। ধৃতদের মধ্যে সিনথিয়া ছাড়াও ছিল আরও দু'টি মেয়ে।

০

মধ্য রাত পেরিয়ে গেছে অনেক আগে। সারা শহর তলিয়ে আছে ঘুমের ঘোরে। এক দঙ্গল পুলিশ রাতের অন্ধকার উপেক্ষা করে কায়রোর হেকিমের বাড়ীর সামনে এসে হাজির হলো। তাদের মধ্য থেকে একজন গিয়ে হেকিমের বাড়ীর গেটে আঘাত করতে লাগলো।

বাড়ীর বুড়ো চাকর 'এত রাতে আবার কার মরার শখ হলো' বলতে বলতে ঘুম থেকে উঠে এসে দরজা খুলে দিল। গিয়াস

বিলকিস বুড়োকে উপেক্ষা করে পুলিশ নিয়ে ঢুকে গেল বাড়ীর ভেতর। সরাসরি হেকিমের শয়ন কক্ষের সামনে এসে থামল তারা।

তাদের হাতে ছিল মশাল। একজন মশাল বা হাতে নিয়ে ডান হাতে হেকিমের শয়ন কক্ষের দরজার কড়া নাড়ল। ভেতর থেকে দরজায় খিল লাগানো। লোকটি উপর্যুপরি কয়েকবার আঘাত করার পর এক অর্ধ উলঙ্গ মেয়ে এসে দরজা খুলে দিল। হেকিমও অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছে। হেকিমের মাথার কাছে পালংকের পাশে মদের সুরাহী ও পিয়ালা সাজানো।

হেকিমের তখন কোন হুশ ছিল না। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে ছিল বিছানায়। তার রোগীরা কখনও কল্পনাও করতে পারবে না, তাদের শ্রদ্ধেয় হেকিমের অবস্থার এত অধপতন হতে পারে।

মেয়েটি তার স্ত্রী ছিল না, এমনকি মুসলমানও না। এই মেয়ে ছিল হেকিমকে দেয়া খৃস্টানদের নানা উপহার সামগ্রীর মতই এক উপহার। খৃস্টানদের দেয়া উপহার সামগ্রীতে ভরা ছিল তার কামরা ও গৃহের বিভিন্ন কোণ। স্বর্ণ, রৌপ্য ও নানা রকম মূল্যবান ধাতুর তৈজষপত্রে ঘরটি ভরা। এ অঢেল সম্পদ নিশ্চয়ই হেকিমের সৎ উপায়ে অর্জিত নয়, ভাবতে বাধ্য হলো গিয়াস বিলকিস।

হেকিমের তখনও জ্ঞান ফেরেনি। সেই অজ্ঞান অবস্থায়ই তাকে তুলে আনা হয় তার ঘর থেকে। যখন তার জ্ঞান ফেরে তখন সে নিজেকে আবিষ্কার করে কারাগারের এক গোপন

কক্ষে।

পুলিশ সুপার গিয়াস বিলকিসকে খবর দেয়া হলো, হেকিমের ঘুম ভেঙ্গেছে। তিনি হেকিমের কাছে গেলেন। বললেন, 'এখন দয়া করে কোন কিছু গোপন করতে চেষ্টা করবেন না।'

হেকিম দু'জন সেনা অফিসারের নাম উল্লেখ করে বললো, 'এরা দু'জন মিশরে সুলতান আইয়ুবীর ক্ষমতা ও গদীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এরা দু'জনই খৃস্টানদের সাথে সম্পর্ক রাখে। ক্রুসেডাররা এদের নেতৃত্বে এখানে একটি গোপন দল সৃষ্টি করেছে।' হেকিম স্বীকার করলো, তিনি নিজেও এই দলের সাথে যুক্ত।

'এই মেয়েটি কে?' গিয়াস বিলকিস প্রশ্ন করলেন।

'এই মেয়েটিকে উপহার হিসেবে খৃস্টানরা আমাকে দান করেছে।'

'আপনি কি করে ওদের সাথে শামিল হলেন?'

'আমি ওদের সাথে শামিল হতে চাইনি। কিন্তু ওদের নানা রকম প্রলোভনে পড়ে যাই আমি। যেই মেয়েটিকে আমার বাসায় দেখেছেন সে মেয়েই আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। ওদের সাথে শামিল না হলে ওরা সমাজে আমার মান সম্মান ধূলার সাথে মিশিয়ে দিত। আমি তাদের ব্ল্যাকমেইলিংয়ের শিকার হয়েছি।'

'শুধু কি এই ভয়েই আপনি তাদের সাথে শামিল হয়েছেন?'

'না, এক দিকে লোভ, অন্য দিকে ভয় আমাকে এদের সাথে যুক্ত করেছে। ওরা আমাকে প্রচুর অর্থ সম্পদ দিয়েছে। তারা আমার এ দাবীও মেনে নিয়েছে যে, তাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত

হলে, আমাকে মন্ত্রীর পদ দান করা হবে।'

হেকিম ছিলেন কায়রোর বিখ্যাত চিকিৎসক। বড় বড় অফিসারদের কাছে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। এই সুবাদে তার বেশ প্রভাব ছিল তাদের ওপর। সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কাজে তাকে ব্যবহারের জন্য ক্রুসেডাররা প্রথমে তাকে টার্গেট করে। পরে তাকে ঘায়েল করার জন্য মেয়েটিকে লেলিয়ে দেয়। মেয়েটি হেকিমকে ঘায়েল করার পর তার আশ্রয়ে থেকে তারা নানা রকম ধ্বংসাত্মক কাজ শুরু করে দেয় তারা।

কায়রোতে যে ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চলছিল তার মূলে ছিল এই হেকিম। সে তার যোগ্যতা বলে আলী বিন সুফিয়ানের বন্ধুত্ব এবং তাঁর বিশিষ্ট কিছু গোয়েন্দাকে চিনে নিয়েছিল। এদের মধ্যে মেহেদী আল হাসানও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যখনই সে পাহাড়ী এলাকায় যাতায়াত এবং দুষ্কৃতকারীদের আড্ডা আবিষ্কারের চেষ্টা শুরু করল, সাথে সাথে টের পেয়ে গেল হেকিম। ক্রুসেডাররা অন্য দুই কমাণ্ডারের মতই তাকেও হত্যা করার পরিকল্পনা করল। কিন্তু হেকিম তাকে দেখে ভিন্ন ফন্দি আঁটল। হেকিম সিদ্ধান্ত নিল, এমন একজন সুন্দর, শক্তিশালী, সাহসী, বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ গোয়েন্দাকে হত্যা করার পরিবর্তে নিজেদের জালে আঁটকে ফেললে কেমন হয়! কথাটা সে দলের নেতৃস্থানীয় কয়েক জনকে বলল। সবাই বলল, 'কিন্তু সে তো আইয়ুবীর খুবই বিশ্বস্তদের একজন। কিভাবে আপনি তাকে দলে টানবেন?'

'সে ব্যবস্থা আমার আছে। আমাকে যেভাবে তোমরা বশীভূত

করেছো, ঠিক সেভাবেই তাকে বশীভূত করারও অনেক পদ্ধতি জানা আছে আমার। আমি যে কয়েকজন মিশরীয় গোয়েন্দাকে হাত করার পরিকল্পনা করেছি, সে তালিকার শীর্ষেই আছে তার নাম। আমি তাকে নিয়ে বেশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলাম। আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগ তাকে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল মনে করে। সে এই দায়িত্ব পাওয়ায় আমার কাজ আরো সহজ হয়ে গেল।'

সবাই বলল, 'ঠিক আছে, আপনি যা ভাল মনে করেন তাই হবে।' ফলে সে ক্রুসেডারদের খুনের হাত থেকে বেঁচে যায়।

হেকিম অনেক ভেবে-চিন্তে মেহেদী আল হাসানকে এই যাদুময় ইন্দ্রজালে আটকানোর চেষ্টা করে। তার পূর্ণ আস্থা ছিল, এমন পরী রূপী প্রেতাত্মার মোহে সে অবশ্যই বশে এসে যাবে।

একবার তাকে রূপের মোহে ফেলতে পারলে পরবর্তীতে তার চিন্তার পরিশুদ্ধির কাজ নিয়ে আর মোটেও ভাবতে হবে না। নারী ও হাশিশের নেশায় সে আপনাতেই পরিবর্তিত হয়ে যাবে। কারণ এই প্রক্রিয়াটির সাফল্য বহুল পরীক্ষিত। যত জায়গায় এই পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে ততবারই তা সাফল্য বয়ে এনেছে।

কিন্তু যাদের ঈমান দৃঢ় তারা নারীর ইন্দ্রজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে যায়। যদি মেহেদী আল হাসানও তেমনি দৃঢ়মনা ঈমানদার হয়ে থাকে তবে তার নিজের মৃত্যুর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে।

যে দু'জন কমাণ্ডার রহস্যপূর্ণভাবে নিহত হয়েছিল, হেকিম

তাদের সম্পর্কে বলেছিল, তাদেরকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়েছিল। দু'জনকেই হেকিম এমন বিষ প্রয়োগ করেছিল, যার স্বাদ ও গন্ধ সামান্যতম তিক্ত বা ঝাঁঝালো নয়। এতে মানুষ তার দেহের মধ্যে কোন প্রকার কষ্ট ও পরিবর্তন অনুভব করে না। এ বিষ প্রয়োগের বার থেকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কোন এক সময় লোকটি হঠাৎ মারা যায়।

সেই দুই কমাণ্ডারকে হত্যা করার কারণ ছিল, তারাও ঈমান বিক্রি করতে রাজি হয়নি। তারা সুলতান আইয়ুবী ও তাঁর সরকারের প্রতি একান্ত অনুগত ও বাধ্য ছিল। তাদের দু'জনকে কেনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় ক্রুসেডাররা। তারা দু'জনেই বিশ্বাঘাতকতার পরিবর্তে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করল। স্বাভাবিক ভাবেই তারা বিশ্বাসঘাতকদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

হেকিম প্রথম জনকে পথে পেয়ে কথায় কথায় তাকে দাওয়াখানায় নিয়ে যায়। পরে তার চোখ ও নাড়ি দেখে তার মধ্যে গোপন অসুখ বাসা বেঁধে আছে বলে তাকে বিচলিত করে তোলে। তারপর তাকে বলে, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই। এ ঔষধটুকু খেয়ে দেখো, যদি অসুখ না থাকে ক্ষতি নেই, আর থাকলে এতেই ভাল হয়ে যাবে। ভয় নেই, ঔষধের দাম তোমাকে দিতে হবে না। দ্বীনের পথের মুজাহিদ তোমরা, এটুকু সেবা করার সুযোগ এই বুড়োকে দাও।'

ঔষুধের পরিবর্তে বিষ খাইয়ে বিদায় করে দেয় সেই কমাণ্ডারকে। এ বিষ হেকিম পেয়েছিল ফেদাইনদের কাছ

থেকে।

দ্বিতীয় কমাণ্ডারের বেলায়ও একই রকম ঘটনা ঘটে। তাকেও প্রথমে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বাগে আনতে না পেরে একই পদ্ধতিতে গোপন ব্যাধির ধোঁকায় ফেলে ঔষুধের পরিবর্তে বিষ পান করায়।

হেকিম অবশ্য এসব তথ্য সহজে প্রকাশ করেনি। তার মুখ খুলতে তাকে বাধ্য করা হয়। কয়েদখানার ভয়াবহ শাস্তির যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে অবশেষে বুড়ো সব কথাই গিয়াস বিলকিসের কাছে প্রকাশ করে দেয়।

হেকিম তার জবানবন্দীতে আরো জানায়, 'একদিকে সৈন্যদের মাঝে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে; অপরদিকে গোপনে নেশার দ্রব্য সরবরাহ করা হচ্ছে সৈনিক ও যুবকদের মাঝে। যুবকদের চরিত্র হনন ও ব্ল্যাকমেইলিং করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে মেয়ে কর্মীদের। সামরিক অফিসারদেরকেও সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে নানা কায়দায়। এদের মধ্যে যারা কট্টর দেশপ্রেমিক তাদেরকে কৌশলে গোপনে হত্যা করার কাজও শুরু হয়ে গেছে। সুদানী বাহিনী শীঘ্রই মিশর সীমান্তে আক্রমণ শুরু করতে যাচ্ছে। এ আক্রমণে নেতৃত্ব দেবে ক্রুসেড বাহিনী। মিশরের সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলোর লোকদেরকে অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করার পরিকল্পনাও রয়েছে ওদের।

এই ষড়যন্ত্রের উদঘাটন, দেশদ্রোহীদের গ্রেফতার ও তাদের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে মিশরের মাত্র তিনজন লোক সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন। এঁরা হলেন গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন

সুফিয়ান, পুলিশ প্রধান গিয়াস বিলকিস এবং মিশরের ভারপ্রাপ্ত সুলতান আমীর তকিউদ্দিন। কিন্তু এ গোপন তৎপরতার খবর অন্য আর কাউকেও জানানো হয়নি।

হেকিম ও তার দলের লোকেরা যাদের নাম উল্লেখ করেছে সে সব সেনাপতি ও অফিসারদের গ্রেফতার করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু সুলতান তকিউদ্দিন এ ব্যাপারে একটু ভীত হয়ে পড়েন। তিনি এই গোপন চক্রান্তকে গোপন রাখারই আদেশ দিলেন। তিনি বললেন, 'এই বিষয়টি এতই নাজুক যে, এ ব্যাপারটা সুলতান আইয়ুবী নিজে এসে সামাল দিলেই সব দিক থেকে মঙ্গলজনক হবে। আমি বিষয়টি সবার আগে তাকে জানাতে চাই।'

আসলেও বিষয়টা বড় জটিল ছিল। পুলিশ ও গোয়েন্দা প্রধানের সাথে আলাপের পর তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, তিনি নিজেই সুলতান আইয়ুবীর কাছে যাবেন এবং তাঁকে মিশর এসে এর সমাধান করার পরামর্শ দেবেন।

আলী বিন সুফিয়ান প্রত্যেক সন্দেহভাজন সেনাপতি ও অফিসারদের পিছনে একটা করে গোয়েন্দা ছায়ার মত লাগিয়ে দিলেন। তকিউদ্দিনকে বললেন, 'এবার আপনি যেতে পারেন।'

তকিউদ্দিন গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে সাক্ষাতের জন্য গোপনে মিশর ত্যাগ করলেন। তার এ যাত্রার কথা বিশেষভাবে গোপন রাখা হলো। হাতে গোণা কয়েকজন ছাড়া সবাই জানল, তিনি শিকারে বেরিয়েছেন।

০

'আমি তোমার মুখে নতুন কোন সংবাদ শুনছি না।' সিরিয়ার কাছে হলবের অনতিদূরে ভ্রাম্যমান হেড কোয়ার্টারে বসে তকিউদ্দিনের কথা শুনে সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমি বলতে পারি না জাতির মধ্যে যে গাদ্দারী ও বিশ্বাসঘাতকতার রোগ ছড়িয়ে পড়ছে, তার চিকিৎসা কেমন করে হবে। আমার দৃষ্টি এখন বায়তুল মুকাদ্দাসে নয়, ইউরোপের ওপর পড়ে আছে। কিন্তু আমার গাদ্দার ও বিশ্বাসঘাতক ভাইয়েরা আমাকে মিশর থেকে বের হতে দিচ্ছে না। তুমি এই রক্ষীদেরকে এখানে নিয়ন্ত্রণ করো। আমি দামেশকে যাচ্ছি, সেখান থেকে মিশরে চলে যাব।'

সুলতান আইয়ুবী তকিউদ্দিনকে রণাঙ্গনের সমস্ত খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার গোয়েন্দারা ওদের এত ভেতরে প্রবেশ করেছে যে, ক্রুসেড বাহিনীর যে কোন আক্রমণের খবর কমপক্ষে দু'তিন দিন আগেই তুমি জানতে পারবে। আমাদের কমাণ্ডো বাহিনী প্রতি মুহূর্তে সক্রিয় রয়েছে। আমি তাদেরকে শত্রু আক্রমণের সম্ভাব্য রাস্তার আশেপাশে লুকিয়ে রেখেছি। বর্তমান সংবাদ হলো, ক্রুসেড বাহিনী আক্রমণ করবে না। যদি তারা আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিতে চায় তবে তুমি ভয় পেও না। তুমি এক জায়াগায় আবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করবে না। শত্রুদেরকে সামনে অগ্রসর হতে দেবে আর প্রথম আঘাত ওদেরকেই করতে দেবে। এ জন্য প্রয়োজন হলে তোমরা পিছু হটে যাবে।

এখানে যুদ্ধের অনুকূল পরিবেশ আছে। সব সময় উঁচু স্থানে

অবস্থান নেবে। বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখবে, আল মালেকুস সালেহ, সাইফুদ্দিন ও যেসব আমীররা আমাদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে, যুদ্ধের সময় তাদের কাছে অতিরিক্ত আশা করবে না। কারণ তাদের মগজে ক্ষমতা ও গদীর নেশা যে কোন সময় চেপে বসতে পারে। আমাদের সাথে তাদের যে চুক্তি হয়েছে, তাতে তারা কোন নিজস্ব বাহিনী রাখতে পারবে না। আমি তাদের মহলেও গোয়েন্দা বসিয়ে রেখেছি। আমি তোমাকে এই নসীহত করে যাচ্ছি, যদি দেখো আমাদের এই মুসলমান ভাইয়েরা যুদ্ধের সময় সামান্য গড়িমসি ও ষড়যন্ত্র করছে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিষয়টি ফায়সালা করে ফেলবে। দ্বিতীয়বারের মত তাদের প্রতি অনুকম্পা দেখানোর কোন প্রয়োজন নেই।'

কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ তাঁর বইতে এই নির্দেশনামা প্রদানের সময় ৫৭২ হিজরী মুতাবেক ১১৭৬ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস উল্লেখ করেছেন।

সুলতান আইয়ুবী তার ভাই তকিউদ্দিনকে সেক্টরের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে দামেশকে চলে যান। এ সময় তার আরেক ভাই শামসুদ্দৌলা তুরান শাহ ইয়েমেন থেকে ফিরে এলেন। ইয়েমেনেও যুদ্ধবাজ খৃস্টানদের তৎপরতা বেড়ে গিয়েছিল। সেখানেও মুসলমানরা তাদের ষড়যন্ত্রে পড়ে ইসলামী হুকুমাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। শামসুদ্দৌলা তাদেরকে শক্ত হাতে দমন করে তবেই সেখান থেকে এসেছেন।

সুলতান আইয়ুবী দামেশকে যাওয়ার পথে তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। ইয়েমেন থেকে তিনি সফলতা নিয়েই ফিরে

এসেছিলেন। সুলতান আইয়ুবী তাকে দামেশকের গভর্ণর নিযুক্ত করে ১১৭৬ সালের অক্টোবর মাসে মিশর যাত্রা করলেন।

কায়রো উপস্থিত হয়েই তিনি গোয়েন্দাদের দেয়া তালিকাটি গভীর মনযোগ দিয়ে পড়লেন। তালিকায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ লোকের নাম ছিল। ছিল একাধিক সামরিক অফিসারের নাম। তিনি তালিকাভুক্ত সবাইকে গ্রেফতার করার আদেশ জারি করলেন।

এই গ্রেফতারীর বেলায় কারো পদমর্যাদা বা সামাজিক সম্মানের দিকে তাকালেন না তিনি। গাদ্দারের পদমর্যাদা বা সামাজিক সম্মান যাই হোক, সে একজন গাদ্দার ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তিনি নির্বিচারে গোয়েন্দাদের দেয়া তালিকা অনুসারে সবাইকে গ্রেফতার করলেন।

গ্রেফতারের পর দিন। তিনি গ্রেফতারকৃতদের সব ধনরত্ন, সোনার বার, মূল্যবান তৈজষপত্র যেগুলো গাদ্দারদের আস্তানা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল, সব এনে প্যারেড ময়দানে জমা করার হুকুম দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ হুকুম তামিল করা হলো।

এরপর তিনি এ যাবত খৃস্টানদের যত গোয়েন্দা ও গাদ্দারকে ধরা হয়েছিল, সেই মেয়ে কয়টিসহ, সবাইকে এ ধনরত্নের পাশে এনে দাঁড় করালেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ছিল সেই হেকিম। ছিল একাধিক সেনাপতি ও কমাণ্ডার। এদের সবাইকে শিকলে বেঁধে সেখানে হাজির করা হল।

সুলতান এদের সবাইকে মিশরের সেনাবাহিনীর সদস্যদের

সামনে দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেন। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেনাবাহিনী। তাদের সামনে দিয়ে ওদেরকে শিকলে বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি তাদেরকে শহর ঘুরিয়ে প্যারেড ময়দানে হাজির করতে বললেন। তাই করা হলো। কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তাদেরকে শহর ঘুরিয়ে এনে প্যারেড গ্রাউণ্ডের সেই স্তুপীকৃত ধন-সম্পদের সামনে দাঁড় করানো হলো।

সুলতান আইয়ুবী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করে আসামীদের সামনে এসে থামলেন। তারপর দরাজ কণ্ঠে বললেন, 'আমাকে সংবাদ দেয়া হয়েছে, তোমরা নাকি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য জনগণ ও সৈনিকদেরকে উস্কানী দিচ্ছ।' সুলতান আইয়ুবী গম্ভীর ও উচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'যদি তোমাদের মধ্যে এমন কেউ থেকে থাকো, যে আমাকে আশ্বাস দিতে পারবে, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের মহব্বতে তোমরা আমার বিরুদ্ধে, আমার সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উস্কানী দিচ্ছ, তবে আমি আমার ক্ষমতা ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি। যদি তোমরা আমাকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারো, তোমরা মুসলমানের প্রথম কেবলা কাফেরদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত, স্পেনের মাটিতে আবার ইসলামী শাসন কায়েমের সংকল্প নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাও, তবে তাকে আমি আমার সামনে আসার আহবান জানাচ্ছি।'

তিনি বললেন, 'এই মুহূর্তে যারা অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছো, তাদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকো, তার বিরুদ্ধে যে

অভিযোগ আনা হয়েছে তা মিথ্যা প্রমাণ করতে পারবে, তবে তাকে আমি অপরাধীর সারি থেকে সরে দাঁড়ানোরও সুযোগ দিচ্ছি। আমার এই তলোয়ার আমার ক্ষমতার মসনদ রক্ষা করার জন্য নয়, এ তলোয়ার আমি হাতে নিয়েছি ইসলামের জন্য। যদি কেউ মনে করো আমার চাইতে তুমি এ তলোয়ার হাতে পেলে ইসলামের অধিক সেবা করতে পারবে, তাহলে এগিয়ে এসো, নিয়ে যাও আমার তলোয়ার। নিয়ে যাও আমার অশ্ব, আমি তোমার পক্ষে শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত।'

চারদিকে টু শব্দটিও নেই। মাঠের চারদিক লোকে লোকারণ্য হয়ে আছে। সুলতান থামতেই পিনপতন নিরবতা যেন গ্রাস করে নিল প্যারেড ময়দান। খানিক বিরতির পর আবার ভেসে এল সুলতান আইয়ুবীর কণ্ঠ। তিনি অপরাধীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছো, যে আমার শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে? থাকলে সামনে এসো। কাবার প্রভূর কসম! আমি সত্যি তাকে শাসন ভার অর্পণ করে তার অধীনস্ত সৈনিক হয়ে থাকবো।'

কোন সাড়াশব্দ নেই! গভীর নীরবতা মাঠের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রাখলো!

'আল্লাহর পথের বীর মুজাহিদবৃন্দ!' সুলতান আইয়ুবী সৈন্যদের লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমাদের বিদ্রোহের পথে এগিয়ে দিয়ে এরা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকেই ম্লান করতে চেয়েছিল। তোমাদের সামনে এই যে ধন-রত্নের স্তূপ, এই সম্পদ ওরা ব্যবহার করছিল ইসলামের অগ্রযাত্রা স্তব্ধ করে

দিতে। তোমাদের সামনে এই যে সুন্দরী মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে, এদের পাঠানো হয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে তোমাদের উস্কানি দিতে। এ সম্পদ ও নারী সবই পাঠানো হয়েছে তোমাদের জন্য। জাতির সাথে গাদ্দারীর পুরস্কার হিসাবে এ সম্পদ ও নারী তোমাদের দান করা হবে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছো, যে তার ঈমানের বিনিময়ে এই সম্পদ ও নারী পেতে চাও? থাকলে এগিয়ে এসো! নিয়ে যাও এ্ব।'

আবারও নিরবতায় ছেয়ে গেল সমগ্র প্যারেড গ্রাউণ্ড। কেউ এগিয়ে এল না। কেউ টু শব্দটিও করল না। আইয়ুবী তখন অভিযুক্তদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরা কি অস্বীকার করতে পারবে, এই সম্পদ ও নারী তোমরা বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য হিসাবে পেয়েছিলে? আমি সবাইকে বলছি, যদি আমি মিথ্যে বলে থাকি তবে সবার সামনে এসে বলে যাও, আমি যা বলছি তা মিথ্যে!'

কেউ এগিয়ে এলো না। কেউ সুলতানের কথার কোন প্রতিবাদ করলো না। তখন সুলতান আইয়ুবী ঘোড়া থেকে নামলেন। অপরাধীদের মধ্য থেকে হেকিমের বাহু ধরে টেনে তাকে নিজের ঘোড়ার কাছে নিয়ে এলেন। তিনিই ছিলেন অভিযুক্তদের মধ্যে সবচে বয়স্ক ও মুরুব্বী। তাকে তিনি বললেন, 'আমার অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করো আর বলো, সুলতান আইয়ুবী যা বলেছে সব মিথ্যে কথা।'

হেকিম অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করলো বটে, কিন্তু মাথা নত করে রইলো। সুলতান আইয়ুবী ধমকের সুরে বললেন, 'বলো,

সুলতান আইয়ুবী মিথ্যা বলেছেন।'

হেকিম মাথা উঠালো এবং স্পষ্ট স্বরে বললো, 'সুলতান আইয়ুবী যে কথাগুলো বলেছন, সম্পূর্ণ সত্য বলেছেন।' এ কথা বলেই হেকিম ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়লো।

হেকিম অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে ছিল। সুলতান আইয়ুবী তাকালেন উপস্থিত জনতার দিকে। বললেন, 'তোমরা সবাই শুনেছো হেকিম কি বলেছেন। এবার তোমরাই বলো এই গাদ্দারদের কি শাস্তি হতে পারে?'

চতুর্দিক থেকে গগনবিদারী রব উঠলো, 'গাদ্দারদের কল্লা চাই, বিশ্বাসঘাতকের ক্ষমা নাই।'

কিছুক্ষণ এভাবেই কাটলো। মুহূর্মুহূ শ্লোগানে মুখরিত হচ্ছে প্যারেড ময়দান। উত্তেজিত জনতা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ছুটে আসতে চাইছে বন্দীদের দিকে। সুলতান আইয়ুবী দুই হাত উপরে তুলে জনতাকে শান্ত হওয়ার আহবান জানালেন। আস্তে আস্তে কমে এলো কলরব। জনতা থামলে তিনি তলোয়ার বের করলেন এবং এক আঘাতেই হেকিমের শির ভূলুণ্ঠিত করে দিলেন।

এরপর তিনি তার অশ্বপৃষ্ঠে আবার আরোহণ করে উচ্চস্বরে বললেন, 'হে আল্লাহর সৈনিকগণ, যদি আমি সঠিক বিচার না করে থাকি, তবে আমার তলোয়ার নিয়ে নাও। তারপর আমার তলোয়ার দিয়েই আমার শিরচ্ছেদ করো।'

তিনি তার তলোয়ার বর্শার মত মাটিতে ছুঁড়ে মারলেন। তলোয়ারের মাথা মাটিতে বিদ্ধ হয়ে গেল। বাটসহ তলোয়ারটি দুলতে লাগলো।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর এক সেনাপতি ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে তলোয়ারটি মাটি থেকে উঠিয়ে দুই হাতের তালুতে রেখে সুলতানের সামনে হাজির হয়ে বললো, 'মুহতারাম সুলতান! এত বেশী আবেগময় হওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনি যা করেছেন, ঠিকই করেছেন।'

সৈন্যদের মাঝেও এ সময় ভীষণ শোরগোল উঠলো। সেনাপতির কথা সেই শোরগোলের মাঝে হারিয়ে গেল। সৈন্যরা জনতার সাথে একাত্ম হয়ে গগনবিদারী আওয়াজে অপরাধীদের নিশ্চিহ্ন করার দাবী জানাচ্ছিল।

সুলতান আইয়ুবী আবার হাত উঠিয়ে সৈন্যদলকে শান্ত হওয়ার আহবান জানালেন। সৈন্য এবং জনগণ শান্ত হলে তিনি ঘোষণা করলেন, 'গাদ্দারী এক অমার্জনীয় অপরাধ। যাদের অপরাধ প্রমাণিত হবে তাদেরকে যথাযথ শাস্তি দেয়া হবে।'

এই ঘোষণা সকলকে শুনিয়ে তিনি অপরাধীদের আদালতে হাজির করার হুকুম দিলেন। পুলিশ কড়া নিরাপত্তায় অপরাধীদের আদালতের দিকে নিয়ে চলল। জনগণ তাদের শাস্তি দাবী করতে করতে চলল তাদের পিছু পিছু। কিন্তু আদালতের গেটে তাদের বাঁধা দিল পুলিশ। জনগণ তখন তাদের শাস্তি দাবী করে মিছিল করতে করতে শহরময় ছড়িয়ে পড়লো।

সেদিনই সুলতান আইয়ুবী সুদানে দূত মারফত এক লিখিত চরমপত্র পাঠালেন। তাতে তিনি লিখলেন, 'যদি মিশর সীমান্তে সুদানী সেনাদের সামান্য তৎপরতাও পরিলক্ষিত হয়

এবং তাতে সীমান্তে অশান্তি দেখা যায়, তবে তা মিশরের উপর আক্রমণ বলে গণ্য করা হবে। আর সে আক্রমণের সমুচিত জওয়াব দেয়া হবে সুদানের উপর সেনা অভিযান চালিয়ে। আর এমনটি হলে, সুদান জয় করে সেখানে ইসলামী রাজ্যের পতাকা উড্ডীন না করে কোন মুজাহিদ ঘরে ফিরবে না।'

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর তলোয়ার থেকে যে রক্ত ঝরছিল, সে রক্ত পরিষ্কার না করেই তিনি তলোয়ার খাপে আবদ্ধ করেন। এ রক্ত সেই বিশ্বাসঘাতক হেকিমের, যে ক্রুসেড বাহিনীর চর হিসাবে ইসলামী রাষ্ট্রের সংহতি ও নিরাপত্তার বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়েছিল।

হেকিম ছাড়া আর যেসব অপরাধীদের গাদ্দারী ও শত্রুর সাথে যোগসাজশ করার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাদেরকে দ্রুত আদালতের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সুলতান আইয়ুবী সেনাপতি, কমাণ্ডার ও সেনাবাহিনী পরিবেষ্টিত অবস্থায় অস্থির হয়ে এদিক-ওদিক পায়চারী করছিলেন। তখনও তার চোখের ওপর ভাসছে বিশ্বাসঘাতকের রক্তের লালিমা।

তিনি অনেক কিছুই বলে ফেলেছেন। আবার অনেক কিছু বলতে বলতে থেমে গেছেন। এই বিশাল সমাবেশে উপস্থিত সর্বস্তরের লোক তার আবেগ ও মনোভাব ভাল মতই বুঝতে পেরেছিল। কেউ সুলতান আইয়ুবীর সাথে কথা বলতে ও চোখে চোখ রেখে তাকাতে সাহস পাচ্ছিল না।

'মাননীয় সুলতান!' এক সেনাপতি সাহসে ভর করে বললেন, 'আমরা ক্রুসেড বাহিনীর কোন ষড়যন্ত্রই সফল হতে দেবো না।'

সুলতান আইয়ুবী তার দিকে তাকালেন। সে চোখে সীমাহীন বেদনার ছাপ। তিনি নিজের রক্তাক্ত তলোয়ার কোষমুক্ত করে তার চোখের সামনে মেলে ধরে বললেন 'এ রক্ত কার? এ রক্ত আমার, তোমার; তোমাদের সকলের! এ রক্ত আমার ভাইয়ের, আমার সন্তানের! যারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে মসজিদে জামায়াতে নামাজ আদায় করেছে, এ রক্ত তাদের! এদের ঘরে রয়েছে পবিত্র কুরআন, রয়েছে নবীর হাদীস। যদি এ রক্তই বিশ্বাসঘাতক ও গাদ্দার হয়ে যায়, তবে মনে করবো, ক্রুসেড বাহিনীর সকল ষড়যন্ত্রই সফল হয়েছে। তারা ইসলামের সেই সৈনিকদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ও সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দিয়েছে, যারা খৃস্টানদের কবল থেকে ফিলিস্তিন উদ্ধার করতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। তারা আমাদের শক্তি এত দুর্বল করে দিয়েছে যে, আমরা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আর ফিলিস্তিন উদ্ধার করতে সমর্থ হবো না। আমাদের গন্তব্যস্থান ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। আজ এই সময় আমাদের কায়রো থাকার কথা নয়, জেরুজালেম থাকার কথা। কিন্তু এত রক্ত ঝরানোর পরও তারা আমাদেরকে কায়রো বসিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে।'

সুলতান আইয়ুবী তার তলোয়ার প্রহরীর কাছে দিয়ে বললেন, 'যদি এ রক্ত কোন কাফেরের হতো তবে আমি তা পরিষ্কার করতাম না। কিন্তু এ রক্ত এক গাদ্দারের! এ রক্তের কোন

গন্ধও যেন তলোয়ারে বা কোষে না থাকে।'

প্রহরী তলোয়ার ও খাপ পরিষ্কার করতে বাইরে নিয়ে গেল। সুলতান আইয়ুবী উপস্থিত সেনা সদস্যদের বললেন, 'ক্রুসেড বাহিনীর প্ল্যান ও ষড়যন্ত্র সত্যি সফল হয়েছে। তারা চাচ্ছিল, আমি যেন হলব থেকে সামনে অগ্রসর হতে না পারি। দেখো তাই হয়েছে, আমি সামনে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে এখন কায়রোতে ফিরে এসেছি।

এখন ক্রুসেড বাহিনী অগ্রসর হতে থাকবে। আমরা দীর্ঘ তিন বছর আপোষে যুদ্ধ করেছি। এই সুযোগে ক্রুসেড বাহিনী সুসংহত ও সুগঠিত হয়ে আমাদেরকে চির দিনের মত পরাজিত ও নিঃশেষ করতে প্রস্তুত হয়েছে।

ত্রিপলীর খৃস্টান রাজা রিমাণ্ড বলেছেন, 'আমরা মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে এবং কায়রোতে নাশকতামূলক কাজ বাড়িয়ে সুলতান আইয়ুবীকে কায়ারোমুখী করতে সমর্থ হয়েছি।' তার এ কথায় কোন মিথ্যা নেই। ক্রুসেড গোয়েন্দারা আমাদের সমস্ত তৎপরতার সংবাদ যথাসময়ে ওখানে সরবরাহ করে থাকে। যখনই আমি হলব থেকে রওনা হয়েছি, তখনই তারা জেনে গেছে, আমি হলব থেকে কায়রো চলে এসেছি। আমার দায়িত্বে আমার ছোট ভাই তকিউদ্দিন এখন রণাঙ্গণে আছে। সঙ্গে সঙ্গে এ সংবাদ জেরুজালেম থেকে আক্রা এবং সমস্ত খৃস্টান রাজ্যেই পৌঁছে গেছে।

আমরা খবর পেয়েছি, সমস্ত ক্রুসেড নেতারা এখন ত্রিপলীতে গিয়ে একত্রিত হয়েছে। তারা সেখানে কি আলোচনা করছে তাও আমরা জানতে পারছি। রাজা রিমাণ্ড সমবেত

নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'সুলতান আইয়ুবী জেরুজালেম জয় করতে বের হয়েছিল। আমরা কোন তীর না চালিয়েই তাকে মিশরের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি। তার হাত দিয়েই মুসলমান আমীর ও শাসক গোষ্ঠীকে অকেজো করে দিয়েছি। আমরা এর চেয়ে বড় সফলতা আর কি লাভ করতে পারি! এখন আমাদের আর সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই।'

'এই সফলতাকে তেমন বড় সফলতা বলা যায় না, আপনি যেমন বলছেন।' খৃস্টান রাজা বিলডন তার কথার প্রতিউত্তরে বলেছেন, 'আমরা আক্রমণের জন্য রাস্তা উন্মুক্ত করেছি মাত্র। আসল কাজ তো আক্রমণ করা। তখন সফলতা লাভ করলেই বলবো বড় সফলতা লাভ হয়েছে। এখন সৈন্যবাহিনী সুগঠিত করে অভিযান চালাতে হবে। সুলতান আইয়ুবীকে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ দেয়া যাবে না।'

আইয়ুবী বললেন, 'যদি আমরা আমাদেরকে দ্রুত শুধরে নিতে না পারি তবে বলতে পারি না, এর পরিণাম ফল কি হবে।'

সুলতান আইয়ুবী তার সেনাপতি ও কমাণ্ডারদের বললেন, 'আজ থেকেই নতুন ভর্তি শুরু করে দাও। অশ্বারোহী বাড়াও। সুদানী সেই সব সৈনিকদেরকেও নুতন করে ভর্তি করে নাও, যাদের সাত বৎসর আগে বিদ্রোহের অপরাধে সেনাবাহিনী থেকে বের করে ক্ষেতের কষ্টসাধ্য আবাদী কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল। এরা এই কাজ করে মিশরে অনেক সুখ-সাচ্ছন্দ পেয়েছে। তারা আর বিদ্রোহ করবে না। যে সব যুবক অশ্ব ও তলোয়ার চালনায় পটু তাদেরকে উত্তমরূপে ট্রেনিং দাও। আমি খুব শীঘ্রই মিশর থেকে বের হয়ে যেতে চাই।

যদি ক্রুসেড বাহিনীর মাথা খারাপ হয়ে থাকে তবে তারা আমার অনুপস্থিতিতে দ্রুত আক্রমণ চালিয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। তারা রণকৌশলে আনাড়ী নয়। আমার জন্য বর্তমান অবস্থা তারাই সৃষ্টি করেছে, যার দরুণ আমি বাধ্য হয়ে মিশরে চলে এসেছি। তারা বায়তুল মুকাদ্দাসকে রক্ষা করতে চাইলে, অধিকৃত এলাকা থেকে বের হয়ে এসে যুদ্ধ করবে। এই যুদ্ধের জন্য আমাদের অনেক সৈন্যের প্রয়োজন।'

ত্রিপলীর রাজ দরবার। কথা হচ্ছিল সম্রাটদের মধ্যে। 'আমি এই মুহূর্তে আড়াই শ' বর্ম পরিহিত নাইটকে যুদ্ধের ময়দানে দাঁড় করাতে পারি।' ত্রিপলীর কনফারেন্সে প্রসিদ্ধ খৃস্টান রাজা রিজন্যাল্ট বললেন, 'এই যুদ্ধের নেতৃত্ব আমার সামরিক বাহিনীর কমাণ্ডে থাকবে। আমি যুদ্ধের প্ল্যানও তৈরি করে রেখেছি। যুদ্ধের প্ল্যান হলো, আমরা সামনাসামনি লড়াই করবো, সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর মত চোরের ন্যায় লুকিয়ে যুদ্ধ করবো না। আমরা প্লাবনের মত সামনে এগিয়ে যাবো। সকল বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করেই এ অভিযান শুরু করতে হবে। তখন আপনারা অনুভব করতে পারবেন, অশ্ব ও মানুষের এই বিশাল প্লাবন আরব দেশের সমস্ত বাঁধা খড়-কুটোর মত উড়িয়ে নিয়ে যাবে। এমনকি মিশরকেও পদদলিত করতে পারবে এই বাহিনী। আমরা আরব ও মিশর পদদলিত করে একেবারে সুদানে গিয়ে ক্যাম্প করবো।'

আইয়ুবী তাঁর সৈন্যদের বলছিলেন, 'যদি ক্রুসেড বাহিনী

সম্মিলিতভাবে আমাদের ওপর আক্রমণ চালায় তবে আরব ভূমিতে এত বেশী রক্তপাত হবে যে, আবর ভূমির প্রতিটি ধূলিকণা রক্তে সিক্ত হয়ে যাবে। এখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে মাথায় কাফন বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। হে আমার বন্ধুগণ! আমার মন বলছে, আমরা এ যুদ্ধে পূর্ণ প্রস্তুতির সুযোগ পাবো না। তাই আমাদের অতি সাবধানে যুদ্ধের ময়দানে নামতে হবে।'

অপরদিকে ত্রিপলীতে খৃস্টান সম্রাট রিমাণ্ড বলছিলেন, 'সুলতান আইয়ুবীকে সব সময় ব্যস্ত ও সন্ত্রস্থ রাখতে হবে। তার আয়ত্বাধীন এলাকায় আমাদের সন্ত্রাসী তৎপরতা আরও বৃদ্ধি করতে হবে।' রিমাণ্ড এ কথা বলেই তাকাল ক্রুসেড গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হরমনের দিকে। বলল, 'হরমন! তুমি মিশরের ওপর তোমার তৎপরতা আরও জোরদার করে দাও। আইয়ুবী বিশ্রামে সময় নষ্ট করার মত লোক নয়। তার সামরিক বাহিনীর যে ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য আমার মনে হয়, তিনি জরুরী ভিত্তিতে নতুন সৈন্য ভর্তি শুরু করবেন। তুমি চেষ্টা চালাও, যেন নতুন ভর্তিতে সে সৈন্য না পায়। যদি এতে সফল হতে না পারো, তবে তার বাহিনীতে গুপ্ত হত্যা চালাও। সেখানে তাঁর সৈন্যের উপরে কড়া দৃষ্টি রাখো। বিশেষ করে মিশর ও কায়রোর গোয়েন্দাদের হুকুম দাও, তারা যেন সুলতান আইয়ুবীর গতিবিধির উপর সব সময় কড়া দৃষ্টি রাখে এবং কোন সংবাদ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে তা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়।'

তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেক খৃস্টান রাজ রিজন্যাল্ট বলে উঠল, 'আর, হরমন! মিশরের খবর যথাসময়ে পাও বা না পাও, তার চেয়ে বেশী সাবধান থাকবে যেন এখানকার কোন সংবাদ ওখানে পৌছতে না পারে আমাদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে, সুলতান আইয়ুবী যেমন যুদ্ধের ময়দানে আমাদের জন্য মহা বিপদ, তেমনি গোয়েন্দাগিরীতেও আমাদের চেয়ে বেশী সতর্ক! আমাদের মধ্যেও তার স্পেশাল গোয়েন্দারা বিচরণ করছে। এখানকার মুসলিম বসতির উপরে কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে। যাকে সামান্য সন্দেহ হয়, তাকেই কারারুদ্ধ করবে। ইচ্ছে হলে হত্যা করবে। এ ব্যাপারে তোমার ইচ্ছাই আইন।'

•

'আমি কারো মনের খবর জানি না।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'বিশ্বাসঘাতকদের মাথায় শিং গজায় না যে দেখলেই তাদের চেনা যাবে। তাই আমি আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলকিসকে বলে রেখেছি, যাকেই খৃস্টান গোয়েন্দা বলে সন্দেহ হবে, তাকেই বন্দী করবে। নিশ্চিত হলে হত্যা করবে। আর যদি তাদের ওপর খুব বেশী করুণা করতে চাও তবে তাদেরকে কারাগারে পাঠিয়ে দেবে। সম্মিলিত খৃস্টান বাহিনী আমাদের আক্রমণ করার জন্য ছুটে আসছে। এ অবস্থায় কাউকে ক্ষমা করে বিপদ বাড়ানোর ঝুঁকি নেয়ার পক্ষে নই আমি। প্রয়োজনে বিচার কার্য ত্বরান্বিত করো। এ জন্য বিচার পদ্ধতি পরিবর্তনেও আমার আপত্তি নেই।'

সুলতান কথা বলছিলেন আলী বিন সুফিয়ানের সাথে। তি

তাঁর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন, 'আমার বিশ্বাস, তুমি শত্রু কবলিত এলাকাতেও জাল বিছিয়ে রেখেছো! ক্রুসেড বাহিনীর আশেপাশে আরও কিছু লোক পাঠিয়ে দাও। আর সেখানকার গোয়েন্দাদের বলো, তারা যেন সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই তা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়। প্রয়োজনে বিপদরে ঝুঁকি নিয়েও তাদেরকে তীর বেগে কায়রো পৌছতে হবে। আমাকে তোমরা অন্ধ করে রেখো না আলী! আর সতর্ক থেকো, যেন এখান থেকে কোন সংবাদ বাইরে চলে না যায়।'

সাজ সাজ রব চলছে ত্রিপলীতে। 'যদি আমাদের অভিযান সম্মিলিত কমাণ্ডে হয়, তবে আমাদের যোদ্ধারা আরও বেশী সংহত হয়ে যুদ্ধ করতে পারবে।' রাজা রিজন্যাল্ট বললেন, 'আমি সব সময় ঐক্যবদ্ধ কমাণ্ডে যুদ্ধ করার উপর বেশী গুরুত্ব দেবো।'

রাজা রিমাণ্ড বললেন, 'সম্মিলিত কমাণ্ডের কিছু ক্ষতিও আছে। যুদ্ধের ময়দানে আমাদের পরষ্পরের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে হবে। একে অপরের সম্মুখে যেন বাঁধার সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তারচে বরং আমরা এলাকা ভাগ করে নিয়ে অভিযান চালাতে পারি। তবে এ কথার সাথে আমিও একমত, আমাদের প্রস্তুতির খবর যেন বাইরে না যায় সে ব্যাপারে কঠিন সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

এমনিভাবে দু'দিকেই শুরু হয়ে গেল যুদ্ধের সাজ সাজ রব।

ক্রুসেড বাহিনী এবার সুলতান আইয়ুবীকে শেষ বারের মত পরাস্ত করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মাঠে নামছে। সুলতান আইয়ুবীও আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন ক্রুসেড বাহিনীর বেপরোয়া চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র দেখে।

ক্রুসেড বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় তিন মুসলিম শাসক মিলিতভাবে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে শেষ শক্তি দিয়ে লড়াই করেছে। প্রায় তিন বছর মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে শক্তি ক্ষয় করেছে, নিজের জান ও মাল ধ্বংস করেছে। অবশেষে সুলতান আইয়ুবী চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে তিন মুসলিম শাসককে অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করেছে। তারা সুলতান আইয়ুবীর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু সুলতান আইয়ুবী তার এই বিজয়কে মুসলিম জাহানের জন্য চরম পরাজয় বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এতে ক্রুসেড বাহিনীর স্বার্থ ও ষড়যন্ত্রই সফল হয়েছে।

এই গৃহযুদ্ধে হাজার হাজার আল্লাহর বান্দা নিহত ও আহত হয়েছে। হয়তো এখনো অনেকে পঙ্গু হয়ে জীবন নিয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু এই বেঁচে থাকায় লাভ কি? অথচ এই সৈন্যরা শুধু ফিলিস্তিন নয়, স্পেনও জয় করে ফিরতে পারতো।

এই গৃহযুদ্ধের অবকাশে ক্রুসেড বাহিনী তাদের সামরিক শক্তি আরও বহু গুণ বৃদ্ধি করে নিয়েছে। যুদ্ধের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পেরেছে। তাদের দাবী কোন ভিত্তিহীন কথা নয়। দৃশ্যত তারা এখন প্রবল শক্তি নিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে আসতে পারবে এবং আরব জাহানকে খড়কুটোর মত উড়িয়ে নিয়ে

যেতে পারবে। কারণ তারা জানে, সুলতান আইয়ুবীর দক্ষ ও বীর সৈন্য এবং কমাণ্ডাররা প্রায়ই নি:শেষ হয়ে গেছে। লড়াই করার জন্য এখন আইয়ুবীকে নতুন সৈন্য জোগাড় করতে হচ্ছে।

নতুন ভর্তি সৈন্যদের দিয়ে যুদ্ধ করানো কোন সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু এছাড়া তাঁর কোন উপায় নেই। তাছাড়া তাকে মিশরেও অধিক সৈন্য রাখতে হচ্ছে। কারণ মিশরে সুদানী আক্রমণের ভয় আছে। অধিকন্তু দেশের সর্বত্র গাদ্দার ও দুষ্কৃতকারীদের তৎপরতা বেড়ে গেছে।

খৃস্টানরা তুফানের মত গতি নিয়ে আক্রমণ করার প্ল্যান নিয়েছে এই সংবাদ পেয়ে সুলতান আইয়ুবীও ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতিতে নিমগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি যুদ্ধের গতি ও পদ্ধতি পরিবর্তন করতে নারাজ। তিনি পরিকল্পনা করলেন, তার নতুন ভর্তি সৈন্যদের এক অংশকে তিনি কমাণ্ডো বাহিনীতে রূপান্তরিত করবেন। তারা গেরিলা আক্রমণ চালাবে দুশমনের ওপর। 'আঘাত করো আর পালাও' এই নীতিতেই যুদ্ধ করবেন তিনি।

তবে এখন ক্রুসেড বাহিনী যে ব্যাপক আক্রমণের চিন্তা-ভাবনা করছে তাতে সুলতান আইয়ুবীর কমাণ্ডো অপারেশনের সফলতা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে পড়বে। কারণ তারা কমাণ্ডো বাহিনীকে ঘিরে ফেলে সামনাসামনি মারার চিন্তা-ভাবনা করছে। উভয় পক্ষেই জোর চেষ্টা চলছে, আপন আপন সমর সাজ ও রণ প্রস্তুতির।

নিজেদের পরিকল্পনা ও গতিবিধির গোপনীয়তা রক্ষা করার

পূর্ণ চেষ্টা যেমন চলছে, তেমনি চলছে অন্যের গোপন তথ্য জানার জোর প্রচেষ্টা।

রাশেদ চেঙ্গিস তার নাম। এ খৃস্টান ছদ্মনামেই সবার কাছে পরিচিত। তুরস্কের বাসিন্দা বিধায় খৃস্টানদের মতই সুরত ও বর্ণ পেয়েছে। চাল চলনেও তাই। আর একজন ফ্রান্সের নাগরিক ভীক্টর। এরা দু'জনই গোয়েন্দাগিরীতে নিযুক্ত। বর্তমানে খৃস্টান মেহমানদের সমাদর ও দেখাশোনার কাজে নিয়োজিত। এদের কাজ হচ্ছে খৃস্টান রাজা ও উর্ধতন সামরিক অফিসারদের ভোজসভায় খাবার ও মদ পরিবেশন করা।

রাশেদ চেঙ্গিস খুব চালাক ও বাচাল প্রকৃতির লোক। বাচাল হলেও হাস্যরসিক বলে সবারই প্রিয়ভাজন। ভিক্টর সম্পর্কে তো কারো কোন সন্দেহই থাকার কথা নয়। কারণ সে জাত খৃস্টান ও ফ্রান্সের নাগরিক। যদিও সে তার পরিচয় গ্রীসের নাগরিক বলেই চালিয়ে দিয়েছে।

খৃস্টানদের এত বড় সমাবেশেও তারা দু'জন তাদের নিজস্ব ওর্দী পরে উপস্থিত। যেহেতু খৃস্টানরা মদ পান না করে কোন কাজ শুরু করে না, তাই তারা মেহমানদের মদ পান করাচ্ছিল আর মেহমানদের কথাগুলো গভীর ভাবে গিলছিল।

মেহমানদের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান কথা হচ্ছিল। এসব কথা অতি শীঘ্র কায়রোতে পৌঁছানো প্রয়োজন। কিন্তু সভা এখনও শেষ হয়নি। তারা ক্রুসেড বাহিনীর সমস্ত প্ল্যান জেনে নিয়েই কায়রোতে সে সংবাদ পাঠাতে চাচ্ছিল।

আলী বিন সুফিয়ানের পূর্ণ ভরসা ছিল এই দুই গোয়েন্দার ওপর। খৃস্টানরা আলাপ করছিল, 'সালাহউদ্দিন আইয়ুবী যদি আমাদের গতিবিধি ও প্ল্যান সম্পর্কে জানতে পারে, তবে বিভিন্ন স্থানে ঘাতক লাগিয়ে গোপনে অল্প সংখ্যক কমাণ্ডো সৈন্য দিয়ে আমাদের ব্যাপক ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। অভিযানের সময় এ বিষয়টিও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে।'

'তার আর সে সুযোগ হবে না। আমাদের পরিকল্পনা এবার সৈন্যদেরও জানানো হবে না। তবে তুমি যখন বলছো, তখন বাহিনী যে পথে যাবে সেখানে আগেই গোয়েন্দাদের পাঠিয়ে দেবো, যাতে তারা সে পথে কড়া দৃষ্টি রাখতে পারে।'

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাত্রা পথে খৃস্টানরা তাদের গোয়েন্দাদের পাঠিয়ে দিল এবং কোন সন্দেহভাজন লোক পেলে তাকে পাকড়াও করার কঠিন আদেশ জারি করল।

০

মিশরে সেনা ভর্তির কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে গেল। ভর্তি করার পর বিভিন্ন দলে ভাগ করে ওদের প্রশিক্ষণও শুরু করে দেয়া হলো। আইয়ুবী চাচ্ছিলেন, বিষয়টির ব্যাপক প্রচার। তাই এসব সৈন্যদেরকে সেনা ছাউনী থেকে বের করে শহরময় ঘুরানো হলো। তারা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে শহরময় কুচকাওয়াজ করে বেড়াতে লাগল। উন্মুক্ত ময়দানে এসব সৈন্যরা শক্তি প্রদর্শনী করল। নানারকম শারীরিক

কসরত করে দেখাল। জনগণ উৎফুল্ল কণ্ঠে বাহবা ও করতালি দিল তাদের।

সুলতান সকল ইমামদের আহবান জানালেন মসজিদে জেহাদের গুরুত্ব বর্ণনা করে বিশেষ বয়ান পেশ করার জন্য। সুলতানের এ আহবান ইমামদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য সংবাদ বাহকরা ছুটল চারদিকে। তারা মসজিদে মসজিদে সুলতানের নির্দেশনামা পৌঁছে দিল।

সুলতান আইয়ুবীর এ আহবান পেয়ে মসজিদের ইমামগণ কোরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব কি তা বর্ণনা করে বিভিন্ন নামাজের পর খুতবা দিতে শুরু করল। তারা বলল, 'মুসলমান ভাইসব, কাফেররা আজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলিম জাহানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে অগ্রসর হচ্ছে। এখনও আমাদের প্রথম কেবলা মসজিদুল আকসা কাফেররা দখল করে রেখেছে। এই অবস্থায় মুসলমানদের ওপর জিহাদ ফরজ হয়ে গেছে।'

ইমামগণ বিশেষ করে দেশের যুবকদেরকে মিশরের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে লাগল। এতে কাজও হল বেশ। দেখা গেল, ইমামদের ভাষণ শুনে যুবকরা দলে দলে মিশরের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হচ্ছে। তাদের মধ্যে জেগে উঠছে জেহাদী জযবা। আপন ধর্ম ও মিল্লাতের সম্মান রক্ষার্থে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকেই সেনাবাহিনীতে যোগ দিল।

এরা ছিল অধিকাংশই পল্লীর নিম্নশ্রেণীর যুবক। তারা যেমন সহজে আবেগ তাড়িত হয়ে জেহাদে শামিল হতে ছুটে এসেছিল তেমনি সহজেই তাদেরকে বিভ্রান্ত করাও সম্ভব ছিল। জাতীয় আদর্শের আলোকে তাদের মন-মগজ গড়ে তোলার জন্য যে সময় ও ট্রেনিং দরকার, সেই ট্রেনিং দেয়ার সুযোগ পেল না সেনাবাহিনী। তার আগেই তাদের হাতে তুলে দিতে হল হাতিয়ার।

আবেগের প্লাবন দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয় না। তারা দু'দিনেই ইমামদের নসিহত ভুলে গেল। সেখানে জন্ম নিল আপন স্বার্থ-চিন্তা সামরিক অফিসাররা জাতীয় আদর্শের কথা বলার সুযোগ পায়নি তাদের কাছে। দলে দলে তারা শুধু ভর্তি করে নিয়েছে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে জাতির বেঈমান ও গাদ্দাররা।

এই গণ ভর্তির সুযোগে কিছু বিশ্বাসঘাতকও ঢুকে পড়ল সেনাবাহিনীতে। তারা জিহাদের মর্যাদার কথা না শুনিয়ে কৌশলে এইসব নবাগত সৈনিকদের মনে নানা রকম বিভ্রান্তি ছড়াতে লাগল। সহজ পথ হিসাবে বেছে নিল তাদের মনে ধন-সম্পদের লোভ জাগিয়ে তোলাকে। তারা সবাইকে বুঝাতে চাইল, খৃস্টানদের শহর নগর দখল করতে পারলে সেখানকার অফুরন্ত ধন-সম্পদ লুট করা যাবে। কেউ কেউ আবার এই আশায়ও ভর্তি হল। সুতরাং দেখা গেল, এই নতুন সেনা সদস্যদের অধিকাংশের মনেই জিহাদের শিক্ষার

পরিবর্তে অর্থের লোভ লালসাই প্রকট হয়ে উঠেছে।
এভাবে একদল আনাড়ী ও স্বল্প বুদ্ধির লোক জড়ো হয়ে গেল সামরিক বিভাগে। জেহাদী জযবায় উজ্জীবিত করার আগেই এদেরকে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে রওনা করতে হল। ফলে এসব সৈন্যরা সুলতান আইয়ুবীর জন্য কষ্টদায়ক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

ওদিকে বিভিন্ন খৃস্টান রাষ্ট্র থেকে ক্রুসেড বাহিনী এসে দলে দলে ত্রিপলীর কাছে সমবেত হতে লাগলো। ফিলিস্তিনের অধিকৃত শহরগুলোতেও ক্রুসেডাররা দূত পাঠালো, তারাও যেন সম্মিলিত বাহিনীতে যোগ দেয়।
হুনায়নের সম্রাট রিনাল্ট বহু সৈন্য নিয়ে ত্রিপোলীতে এসে ক্রুসেড বাহিনীতে শামিল হলেন। তার দম্ভ ছিল দেখার মত। কারণ সমবেত ক্রুসেড বাহিনীতে তার সৈন্য সংখ্যাই ছিল সবচে বেশী ও শক্তিশালী। তার সাথে ছিল আড়াইশ নাইট যোদ্ধা। নাইট ক্রুসেড বাহিনীর এক সম্মানজনক সামরিক খেতাব! যারা অসাধারণ বিচক্ষণ, রণবীর ও রণ নিপুন সেই সব অভিজাত সামরিক অফিসারকেই এই খেতাবে ভূষিত করা হয়! এদেরকে দেয়া হয় বিশেষ ধরনের পোষাক ও বর্ম। তারা মূলত বিভিন্ন বাহিনীর কমাণ্ডারের দায়িত্ব পালন করে।
ওদিকে সম্রাট রিজন্যাল্টের মনে জ্বলছিল প্রতিশোধের আগুন। ১১৭৪ সালের প্রথম দিকের ঘটনা। খৃস্টানরা সমুদ্র পথে

আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দর উপকূলে আক্রমণ চালিয়েছিল। কিন্তু সুলতান আইয়ুবী গোয়েন্দা মারফত্ এ আক্রমণের খবর আগেই পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য এমন ব্যবস্থা করেছিলেন, ক্রুসেডদের নৌবাহিনী বলতে গেলে সেই যুদ্ধে একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সেদিন খৃস্টান নৌবাহিনীর সৈন্যরা সাগর কূলে অবতরণেরও সুযোগ পায়নি। এ সময় স্থলপথে আরেকটি বাহিনী সুলতান আইয়ুবীকে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছিল। এই স্থল বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন সম্রাট রিজন্যাল্ট।

তাদের দুর্ভাগ্য, এই অগ্রাভিযানের খবরও আগেভাগেই পেয়ে গিয়েছিল মুসলমানরা। মুসলমানদেব পক্ষ থেকে তাকে মোকাবেলা করার জন্য এগিয়ে গেলেন সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গী। জঙ্গী গোয়েন্দা মারফত ক্রুসেড বাহিনীর সকল পরিকল্পনা জেনে স্থল পথে তাঁর বাহিনী নিয়ে রাস্তায় ওঁৎ পেতে ছিলেন। রিজন্যাল্টের বাহিনী সেখানে এলে তিনি পিছন থেকে ও দুই পাশ থেকে রিজন্যাল্টের বাহিনীর ওপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালান।

রিজন্যাল্ট বিশাল বাহিনী নিয়ে এগুচ্ছিলেন, কিন্তু আক্রমণের পর তার অবস্থা হলো ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত। সারাদিন তিনি সেই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক সাধ্য-সাধনা ও ছুটাছুটি করলেন। কিন্তু কোন লাভ হলো না। যুদ্ধ জয় নয়, একটু পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ খুঁজেও ব্যর্থ হলেন তিনি।

রাতে নূরুদ্দিন জঙ্গীর কমাণ্ডো বাহিনী রিজন্যাল্টের হেড কোয়ার্টারে আক্রমণ চালিয়ে তাকে গ্রেফতার ও বহু সৈন্যকে বন্দী করে।

জল ও স্থল পথে ক্রুসেড বাহিনীর এ আক্রমণ শুধু ব্যর্থ হয়নি, তাদের শক্তি এবং মনোবলও একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। জান ও মালের অশেষ ক্ষতি ছাড়াও রিজন্যাল্টের মত সাহসী সম্রাট ও যোদ্ধা যুদ্ধ বন্দী হয়ে ধরা পড়ে গেল মুসলমানদের হাতে।

নূরুদ্দিন জঙ্গীর জন্য এই যুদ্ধবন্দী ছিল এক মূল্যবান কয়েদী। তিনি তার মুক্তির বিনিময়ে ইসলামের পক্ষে খৃস্টানদের কাছ থেকে বড় রকমের সুবিধা আদায় করে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা আর তার ভাগ্যে ঘটেনি। দুই মাস পর জঙ্গী নিজেই মৃত্যুবরণ করেন।

তার মৃত্যুর পর ক্ষমতালোভী ও সুবিধাবাদী আমলারা তার এগারো বছরের বালক আল মালেকুস সালেহকে পিতার গদীতে আসীন করিয়ে এক পুতুল সরকার গঠন করে। এই সুবিধাভোগীর দলে শামিল হয় উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার, আমলা ও সেনাপতিগণ। মূলত তারাই দেশের শাসক হয়ে বসে।

সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীর যোগ্য সহধর্মিনী এই পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। সারা জীবন যিনি জেহাদের ময়দানে কাটিয়ে দিলেন তার শিশু পুত্রকে ঢাল বানিয়ে কতিপয় সুযোগ সন্ধানীর এই চক্রান্তকে বিনাশ করার

জন্য চাই শক্তি। কিন্তু সেই শক্তি এই মহীয়সী মহিলা কোথায় পাবেন! তখনি তার মনে পড়ল ইসলামের নিষ্ঠাবান খাদেম ও নূরুদ্দিন জঙ্গীর আদর্শের সৈনিক সুলতান আইয়ুবীর কথা। তিনি ইসলামের স্বার্থে এই অপশক্তির বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুলতান আইয়ুবীকে আহবান জানালেন।

সুলতান আইয়ুবী এ আহবানে সাড়া দিয়ে দামেশক এলে এক নিরব গণঅভ্যুত্থান ঘটে গেল। জনতার স্বতস্ফূর্ত সমর্থন ও সহায়তায় আইয়ুবী দামেশকের দায়িত্ব নিলে আল মালেকুস সালেহ ও তার পারিষদবর্গ হলবে পালিয়ে গেল।

এ সময় হারানের গুমাস্তগীন, মুশেলের আমীর সাইফুদ্দিন স্বাধীনতা ঘোষণা করলে আল মালেকুস সালেহ তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। বাধ্য হয় তাদেরকে নিয়ে সম্মিলিত ভাবে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে সামরিক জোট গঠন করতে।

কিন্তু তারা বুঝতে পারে, ত্রিশক্তি মিলেও ইসলামী জনতার রোষ থেকে তারা বাঁচতে পারবে না। আইয়ুবী ইসলামী জনতার সমর্থন নিয়ে এগিয়ে এলে তাকে বাঁধা দেয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। তখন তারা সম্মিলিতভাবে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে সামরিক মোর্চা গঠন করে তাকে পরাজিত করার জন্য ক্রুসেডদের সাথেও জোট বাঁধে। তারা সম্রাট রিজন্যাল্ট ও সমস্ত খৃস্টান যুদ্ধ বন্দীদের নি:শর্ত মুক্তি দিয়ে দেয়। খৃস্টান বাহিনী ছাড়াও আইয়ুবীর অগ্রযাত্রায় এবার প্রতিবন্ধক হয়ে

দাঁড়ায় তিন মুসলিম শক্তি। তখন থেকেই সুলতান আইয়ুবী অবিরত চতুর্মুখী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন।

এভাবেই নূরুদ্দিন জঙ্গীর পুত্র আল মালেকুস সালেহ পিতার একনিষ্ঠ সাগরেদ ও আদর্শের সৈনিক সুলতান আইয়ুবীর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে গেলেন।

এতে মুসলমানদের যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়েই গেল। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো ইসলামের কট্টর দুশমন রিজন্যাল্ট ও তার যুদ্ধবাজ বাহিনীর মুক্তি। মুসলিম রাষ্ট্রের বিশ্বাসঘাতক আমীররা তাদের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা পাওয়ার আশায় বিনা শর্তে তাদের মুক্ত করে দিল। তারপর তিন বছর মুসলিম শক্তি ভ্রাতিঘাতি যুদ্ধে জড়িয়ে থাকা অবস্থায় তারা সুসংবদ্ধ হয়েছে। এখন তারা এক বিশাল সামরিক শক্তি নিয়ে শুধু সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধেই নয়, বরং মুসলিম বিশ্বকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে দেয়ার জন্য চূড়ান্ত সংকল্প নিয়ে ছুটে আসছে।

রিজন্যাল্ট তার পরাজয় ও অপমানের প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা মিটাতে চাচ্ছিল। ক্রুসেডদের এই মিটিংয়ে সবার আলোচনা শুনে সে বলল, 'সমস্ত ক্রুসেড বাহিনী এক সম্মিলিত কমাণ্ডের অধীনে থাকবে।' তার এই বক্তব্যের কারণ হলো, এই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সে স্বাধীনভাবে একটি পরিকল্পনা তৈরী করেছিল। সম্মিলিত বাহিনীর কমাণ্ড স্বাভাবিকভাবেই সে আশা করেছিল তার হাতে থাকবে।

ঐতিহাসিকরা একমত, ক্রুসেডদের এই দুর্বলতাই আরবে তাদের ক্ষতির কারণ হয়েছে। তারা সংখ্যায় বেশী ও উন্নততর যুদ্ধ উপকরণের অধিকারী হয়েও কেবল এই কারণেই সফল হতে পারেনি। অবশ্য ঐতিহাসিকরা এও লিখেছেন, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর দলে যদি গাদ্দার ও বিশ্বাসঘাতক না থাকতো, তবে তিনি আরব ভূখণ্ড থেকে খৃস্টানদের বিতাড়িত করে ইউরোপের ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে পারতেন।

'যদি আপনারা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে পরাজিত করতে চান, তবে প্রত্যেকে তার নিজ নিজ বাহিনীকে সম্মিলিত কমাণ্ডের অধীনে দিয়ে দিন।' ত্রিপলীর রাজা রিমাণ্ড বললেন, 'নতুবা আমরা সকলেই বিচ্ছিন্নভাবে ব্যর্থ ও পরাজিত হবো।' তাকে সমর্থন করে অপর এক সম্রাট বললেন, 'এর কোন প্রয়োজন নেই যে, অভিযানের নেতৃত্ব শুধু রাজা রিজন্যাল্টের বাহিনীই করবে। যুদ্ধে কি করতে হবে সে সিদ্ধান্ত সম্মিলিত বাহিনীর কমাণ্ডকেই করতে হবে।'

'আমি আপনাদের থেকে পৃথক থাকবো না।' রাজা রিজন্যাল্ট বললেন, 'কিন্তু আমি কোন সম্মিলিত কমাণ্ডের অধীনে থাকবো না। আমাকে পরাজয়ের ও অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। নূরুদ্দিন জঙ্গী মারা গেছে, কিন্তু আমি সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে ঠিক আমার মতই বন্দী করে আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে চাই। যেমন তারা

আমাদের দামেশককে নিয়ে গিয়েছিল। নইলে ইতিহাস সব সময় আমাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকবে। আমি আপনাদের সকলের কাছে প্রশ্ন করি, যখন নূরুদ্দিন জঙ্গী আমার উপর কমাণ্ডো আক্রমণ চালিয়ে আমার বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করেছিল, তখন আপনারা কে আমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন? কেউ না। এখন আমাকে আর কেউ বাঁধা দিতে পারবেন না। আমি সেই দিন থেকে সৈন্য যোগাড় করে শক্তি সঞ্চয় করছি। এখন আমার প্রতিশোধ নেয়ার দিন। আমার সৈন্য আপনাদের অন্য কারো সামনে বাঁধার সৃষ্টি করবে না। যাকে আমার সাহায্য দেয়ার প্রয়োজন হবে, তাকে আমরা জীবন বাজী রেখে সাহায্য করবো। কিন্তু আপনাদের সকলের কাছে আমার অনুরোধ, আমাকে বাঁধা দিবেন না।'

'না, তা করবো না।' বিলডন বললেন, 'আমাদের আজকের আলোচনা এখানেই সীমাবদ্ধ থাক। আমরা আজকের আলোচনা থেকে জেনে নিলাম, আমাদের প্রাণপণ চেষ্টায় মুসলমানদের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ হয়েছে তাতে তারা দুর্বল হয়েছে। আমরা এও জানলাম, আমরাই সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে এদিকে আসার পরিবর্তে মিশরে ফিরে যেতে বাধ্য করেছি। সুতরাং আমাদের বিদ্যুৎ বেগে ও ঝড়ের মত আক্রমণ চালাতে হবে।

আসুন আমরা আজ এই সিদ্ধান্তেই একমত হয়ে যাই।

এরপর দু-চার দিন সবাই ব্যক্তিগত ভাবে চিন্তা-ভাবনা করুন। আমাদের মধ্যে যারা অনুপস্থিত আছে তাদেরকে খবর দেয়া হয়েছে। তারা এলে সুবিধা মত একটি দিন বেছে নিয়ে আমরা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হবো। আমাদের সৈন্যরা এখন প্রস্তুত! ইতিমধ্যেই হরমন তার গোয়েন্দা বিভাগকে আরও সক্রিয় করে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর চরদের মাটির তলা থেকে বের করে কারাগারে পাঠাতে শুরু করেছে। এখানকার মুসলমানদের উপরও কড়া দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। প্রতিটি মুসলমানের বাড়ীর ওপর নজর রাখছে আমাদের গোয়েন্দারা। এমনকি প্রতিটি ব্যক্তির দৈনন্দিন গতিবিধির ওপরও দৃষ্টি রাখছে ওরা। আমাদের সৈন্য বাহিনীর সমাবেশও শুরু হয়ে গেছে। এদেরকে আর গোপন রাখা যাবে না। তাই এখন থেকে কোন নারী ও পুরুষকে শহরের বাইরে যেতে দেয়া যাবে না। কেউ বাইরে যেতে চাইলেই মনে করতে হবে, সে গোয়েন্দা।'

'হ্যাঁ, তাই করা হবে।' হরমন বললেন, 'এখান থেকে একটি পাখিও বাইরে যেতে পারবে না।' এভাবেই দু'পক্ষ আরেকটি অনিবার্য ও সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে মেতে উঠল।

পরবর্তী বই ক্রুসেড-২০

পাল্টা ধাওয়া

খুনী চক্রের আস্তানায়

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন